বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

সত্যজিৎ রায়

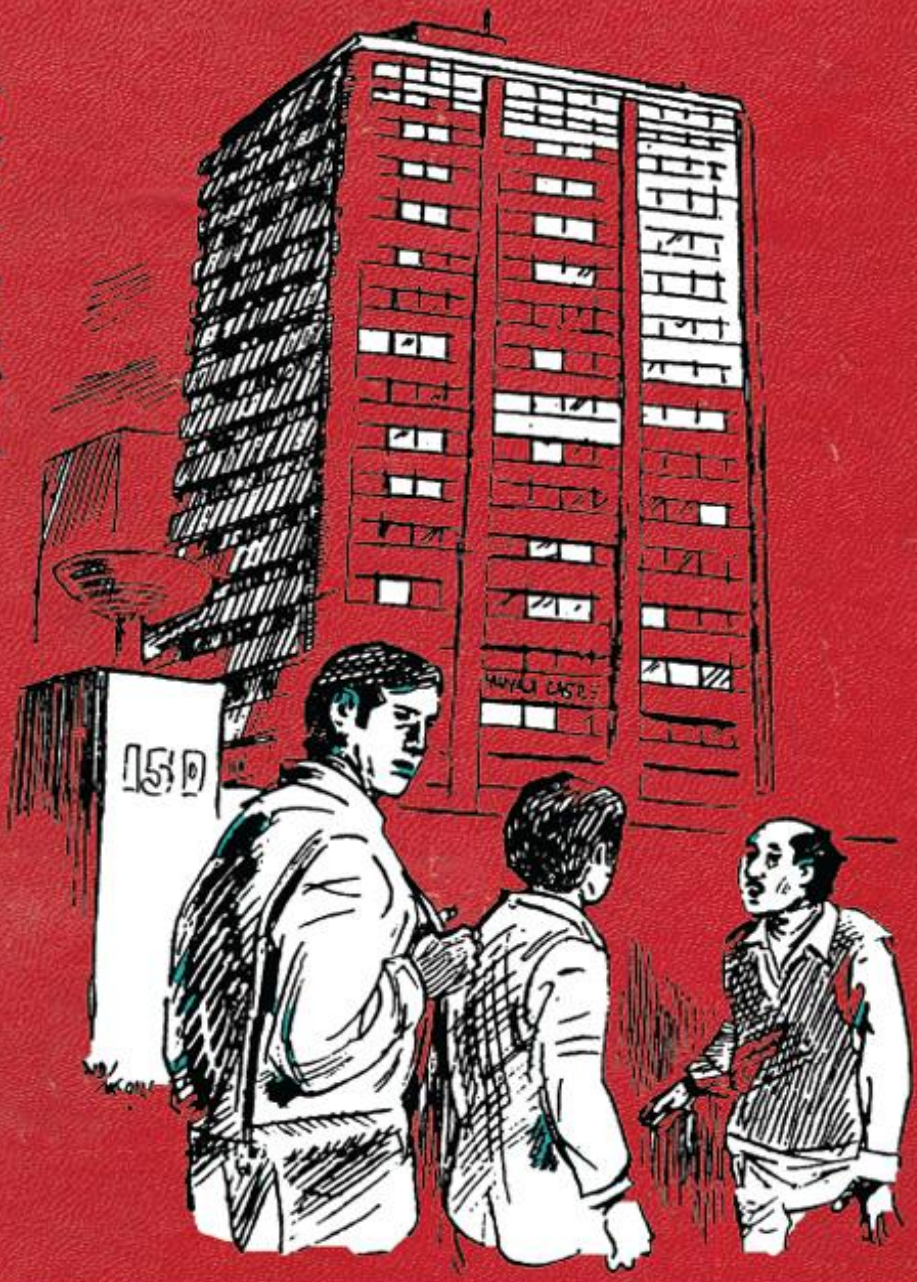

ফেলুদা সিরিজ

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

সত্যজিৎ রায়

রচনাকাল: **জুলাই, ১৯৭৬**

১

লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু-র হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে বেশ অবাক হলাম। সাধারণত ভদ্রলোক যখন আমাদের বাড়িতে আসেন তখন হাতে ছাতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। নতুন বই বেরোলে বইয়ের একটা প্যাকেট থাকে অবিশ্যি, কিন্তু সে তো বছরে দু বার। আজ একেবারে মির্জাপুর স্ট্রিটের হালের দোকান কল্লোল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পঁচিশ টাকা দামের সাদা কার্ড বোর্ডের বাক্স, সেটা আবার সোনালি ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাক্সের দু পাশে নীল অক্ষরে লেখা কল্লোলস্ ফাইভ মিক্স সুইটমিটস—মানে পাঁচ-মেশালি মিষ্টি। বাক্স খুললে দেখা যাবে পাঁচটা খোপ করা আছে, তার একেকটাতে একেক রকমের মিষ্টি। মাঝেরটায় থাকতেই হবে কল্লোলের আবিষ্কার ডায়মন্ডা—হিরের মতো পল-কাটা রুপোর তবক দেওয়া রস-ভরা কড়া পাকের সন্দেশ।

এমন বাক্স লালমোহনবাবুর হাতে কেন? আর ওঁর মুখে এমন কেল্লা-ফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন?

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাক্স টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই ফেলুদা বলল, “বোম্বাইয়ের সুখবরটা বুঝি আজই পেলেন?

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না, কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল।

কী করে বুঝলেন, হে হে?

সাইরেন বাজার এক ঘণ্টা পরে যখন দেখছি আপনার হাতঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, তার মানেই টাটকা আনন্দের আতিশয্যে ঘড়িটা পরার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেননি। —স্প্রিং গেছে, না দম গেছে?

লালমোহনবাবু তাঁর নীল র‍্যাপারের খসে পড়া দিকটা রোম্যান কায়দায় বাঁ কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, পঁচিশ চেয়েছিলুম; তা আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই চাকর এসে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলে। এই যে।

লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা গোলাপি টেলিগ্রাম বার করে পড়ে শোনালেন— প্রোডিউসার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বেটে, প্লিজ কেবল কনসেন্ট আমি রিপ্লাই পাঠিয়ে দিয়ে এলুম—হ্যাপিলি সেলিং বোম্বেটে ফর টেন টেক রেসিংস।

দশ হাজার! ফেলুদার মতো মাথা-ঠাণ্ডা মানুষের পর্যন্ত চোখ গোল গোল হয়ে গেল। দশ হাজারে গল্প বিক্রি হয়েছে আপনার?

জটায়ু একটা হালকা মসলিনি হাসি হাসলেন। টাকাটা হাতে আসেনি এখনও। ওটা বম্বে গেলেই পাব।

আপনি বম্বে যাচ্ছেন? ফেলুদার চোখ আবার গোল।

শুধু আমি কেন? আপনারাও। অ্যাট মাই এক্সপেনস। আপনি ছাড়া তো এ গল্প দাঁড়াতই না মশাই।

কথাটা যে সত্যি, সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোঝা যাবে। জটায়ুর অনেক দিনের স্বপ্ন যে তার একটা গল্প থেকে সিনেমা হয়। বাংলা ছবিতে পয়সা নেই, তাই হিন্দির দিকেই ওঁর ঝোঁক বেশি। এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দি সিনেমার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। বম্বের ফিল্ম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে, নাম পুলক ঘোষাল। আগে গড়পারেই থাকত, লালমোহনবাবুর দুটো বাড়ি পরে। কলকাতায় টালিগঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোখের মাথায় বম্বে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে এখন সে নিজেই একজন হিট ডিরেক্টর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবধি গিয়ে গল্প আর এগোচ্ছে না দেখে জটায়ু ফেলুদার কাছে আসেন। ফেলুদা তখন-তখনই লেখাটা পড়ে মন্তব্য করে—মাঝপথে আটকে ভালই হয়েছে মশাই। এ আপনার পণ্ডশ্রম হত। বোম্বাই নিত না।

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, কী হলে নেবে মশাই বলুন তো। আমি তো ভেবেছিলুম খানকতক কারেন্ট হিট ছবি দেখে নিয়ে তারপর লিখব। দু দিন কিউয়ে দাঁড়ালুম; একদিন পকেটমার হল, একদিন সোয়া ঘণ্টা দাঁড়িয়ে জানলা অবধি পৌছে শুনলাম হাউস ফুল। বাইরে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছিল, কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটায় কোডোপাইরিন খেতে হবে সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলুম।

শেষে ফেলুদাই একটা ছক কেটে দেবে বলল লালমোহনবাবুর জন্য। বলল, আজকাল ডবল রোলের খুব চল হয়েছে, সেটা জানেন তো?

লালমোহনবাবু ডবল রোল কী সেটাই জানেন না।

একই চেহারার দুজন নায়ক হয় ছবিতে সেটা জানেন না? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

যমজ ভাই?

তাও হতে পারে, আবার আত্মীয় নয় অথচ চেহারায় মিল সেটাও হতে পারে। একই চেহারা, অথচ একজন ভাল লোক, একজন খারাপ লোক; অথবা একজন শক্ত-সমর্থ, আর একজন গোবেচারা। সাধারণত এটাই হয়। আপনি একটু নতুনভাবে এক কাঠি বাড়িয়ে করতে পারেন;—একটা ডবল রোলের বদলে এক জোড়া ডবল রোল। এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর ভিলেন হল জোড়া, আর দুই নম্বর হিরো আর দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক জোড়া। এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে, সেটা গোড়ায় ফাঁস করা হবে না। তারপর—

এখানে লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না?

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, তিন ঘণ্টার মালমশলা চাই। আজকাল নতুন নিয়মে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না। কাজেই গল্প অন্যভাবে ফাঁদতে হবে। দেড় ঘণ্টা লাগবে জট পাকাতে, দেড় ঘণ্টা ছাড়াতে।

তা হলে ডবল-রোলেই কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে বলছেন?

তা কেন? আরও আছে। নোট করে নিন।

লালমোহনবাবু সুড়ৎ করে বুক পকেট থেকে লাল খাতা আর সোনালি পেনসিল বার করলেন।

লিখুন—স্মাগলিং চাই—সোনা হিরে গাঁজা চরস, যা হোক; পাঁচটি গানের সিচুয়েশন চাই, তার মধ্যে একটি ভক্তিমূলক হলে ভাল; দুটি নাচ চাই; খান দু-তিন পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্য বা চেজ-সিকুয়েন্স চাই—তাতে অন্তত একটি দামি মোটরগাড়ি পাহাড়ের গা গড়িয়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়; অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য চাই; নায়কের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলেনের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভ্যাম্প বা খলনায়িকা চাই; একটি কর্তব্যবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার চাই; নায়কের ফ্ল্যাশব্যাক চাই; কমিক রিলিফ চাই; গল্প যাতে ঝুলে না পড়ে, তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যপট পরিবর্তন চাই; বার কয়েক পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে গল্পকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভাল, কারণ এক নাগাড়ে স্টুডিয়োর বদ্ধ পরিবেশে শুটিং চিত্রতারকাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। —বুঝেছেন তো?

লালমোহনবাবু ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিলেন।

আর সব শেষে—এটা একেবারে মাস্ট—চাই হ্যাপি এন্ডিং। তার আগে অবিশ্যি বার কয়েক কান্নার স্রোত বইয়ে দিতে পারলে শেষটা জমে ভাল।

লালমোহনবাবুর সে দিনই হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারপর গল্প নিয়ে ঝাড়া দু মাসের ধস্তাধস্তিতে ডান হাতের দুটো আঙুলে কড়া পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সে সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনও কাজ ছিল না—কেদার

সরকারের রহস্যজনক খুনের তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে হয়েছিল ব্যারাকপুর—কারণ লালমোহনবাবু সপ্তাহে দু বার করে ফেলুদার কাছে এসে ধন্না দিচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও জটায়ুর বত্রিশ নম্বর উপন্যাস বোম্বাইয়ের বোম্বেটে মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যায়। আর গল্পটা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক, সে ছবি দেখে কোডোপাইরিন খেতে হবে না। হিন্দি ছবির মালমশলা থাকলেও তাতে হিন্দি ছবির ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি বাড়াবাড়িটা নেই।

পাণ্ডুলিপির একটা কপি পুলক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লালমোহনবাবু। দিন দশেক আগে চিঠি আসে যে, গল্প পছন্দ হয়েছে আর খুব শিগগিরই কাজ আরম্ভ করে দিতে চান পুলকবাবু। চিত্রনাট্য তিনি নিজেই করেছেন, আর হিন্দি সংলাপ লিখেছেন ত্রিভুবন গুপ্তে, যার এক-একটা কথা নাকি এক-একটা ধারালো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিঁধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয়। এই চিঠির উত্তরে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে কিছু না বলেই তাঁর গল্পের দাম হিসেবে পঁচিশ হাজার হাঁকেন, আর তার উত্তরেই আজকের টেলিগ্রাম। আমার মনে হল পঁচিশ চেয়ে লালমোহনবাবু যে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আধবোজা চোখে একটা আঃ শব্দ করে লালমোহনবাবু বললেন, পুলক ছোকরা লিখেছিল যে, গল্পটা বিশেষ চেঞ্জ করেনি; মোটামুটি আমি—থুড়ি, আমরা, যা লিখেছিলাম—-

ফেলুদা হাত তুলে লালমোহনবাবুকে থামিয়ে বলল, আপনি বহুবচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব।

কিন্তু—

আহাঃ—শেকসপিয়রও তো অন্যের গল্পের সাহায্য নিয়ে নাটক লিখেছে, তা বলে তাকে কি কেউ কখনও আমাদের হ্যামলেট বলতে শুনেছে? কখখনও

না। উপাদানে আমার কিছুটা কন্‌ট্রিবিউশন থাকলেও, পাচক তো আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি আর আমার আছে?

লালমোহনবাবু কৃতজ্ঞতায় কান অবধি হেসে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। —যাই হোক, যা বলছিলাম। কেবল একটি মাত্র মাইনর চেঞ্জ করেছে গল্পে।

কী রকম?

সে আর বলবেন না মশাই। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি শুনলেই বলবেন টেলিপ্যাথি। হয়েছে কী, আমার গল্পের স্মাগলার ঢুনটিরাম ধুরন্ধরের বাসস্থান হিসেবে একটা তেতাল্লিশ তলা বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের উল্লেখ করেছিলুম। আপনি খুঁটিনাটির ওপর নজর দিতে বলেন, তাই বাড়িটার একটা নামও দিয়েছিলুম—শিবাজী কাসল। বোম্বাই তো–তাই মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীরপুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছিল। ওমা, পুলক লিখলে ওই নামে নাকি সত্যিই একটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, আর তাতে নাকি ওর ছবির প্রোডিউসার নিজেই থাকেন। বলুন, একে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কী বলবেন?

কুং-ফু থাকছে না বাদ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে এনটার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মাথায় ঢুকেছিল যে গল্পে কুং-ফু ঢোকাবেন। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বললেন, আলবত থাকছে। সেটার কথা আমি আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছিলুম; তাতে লিখেছে, ম্যাড্রাস থেকে স্পেশালি কুং-ফু-র জন্য ফাইট মাস্টার আসছে। বলে নাকি হংকং-ট্রেনড।

শুটিং শুরু কবে?

সেইটে জিজ্ঞেস করে আজ একটা চিঠি লিখছি। জানার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিক্স করব। আমাদের—থুড়ি, আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে, আর আমরা সেখানে থাকব না সে কী করে হয় মশাই?

ডায়মন্ডা এর আগেও খেয়েছি, কিন্তু আজকে যতটা ভাল লাগল তেমন আর কোনওদিন লাগেনি।

২

পরের রবিবার আবার লালমোহনবাবুর আবিভাব। ফেলুদা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ভদ্রলোককে অর্ধেক খরচ অফার করবে, কারণ ওর নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে। শুধু কেস থেকে নয়; গত তিন মাসে ও দুটো ইংরেজি বই অনুবাদ করেছে—উনবিংশ শতাব্দীর দুজন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী—দুটোই ছাপা হচ্ছে, আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকা পেয়েছে ও। এর আগেও অবসর সময় ফেলুদাকে মাঝে

মাঝে লিখতে দেখেছি—কিন্তু আদা-নুন খেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম।

লালমোহনবাবু অবশ্যি ফেলুদার প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, খেপেছেন? লেখার ব্যাপারে আপনি এখন আমার গাইড অ্যান্ড গডফাদার। এটা হল আপনাকে আমার সামান্য দক্ষিণ।

এই বলে পকেট থেকে দুটো প্লেনের টিকিট বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, মঙ্গলবার সকাল দশটা পয়তাল্লিশে ফ্লাইট। এক ঘণ্টা আগে রিপোর্টিং টাইম। আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদের জন্য ওয়েট করব।

শুটিং আরম্ভ হচ্ছে কবে?

বিষ্যুদ্‌বার। একেবারে ক্লাইম্যাকসের সিন। সেই ট্রেন, মোটর আর ঘোড়ার ব্যাপারটা।

এ ছাড়াও আর একটা খবর দেবার ছিল লালমোহনবাবুর।

কাল সন্ধেবেলা আরেক ব্যাপার মশাই। এখানকার এক ফিলিম প্রোডিউসার—ধরমতলায় আপিস—আমার পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। সেও 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ছবি করতে চায়। বলে বাংলায় হিন্দি টাইপের ছবি না করলে আর চলছে না। গল্প বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বেশ হতাশ হল। বইটা অবিশ্যি উনি নিজে পড়েননি; ওঁর এক ভাগনে পড়ে ওঁকে বলেছে। আমি বোম্বাই না গিয়েই বইটা লিখেছি শুনে বেশ অবাক হলেন। আমি আর ভাঙলুম না যে মারে-র গাইড টু ইন্ডিয়া আর ফেলুমিত্তিরের গাইডেন্স ছাড়া এ কাজ হত না।

ভদ্রলোক বাঙালি?

ইয়েস স্যার। বারেন্দ্র। সান্যাল। কথায় পশ্চিমা টান আছে। বললেন জব্বলপুরের মানুষ। গায়ে উগ্র পারফিউমের গন্ধ। নাক জ্বলে যায় মশাই। পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাখে এই প্রথম এক্সপেরিয়েন্স করলুম। যাই হোক, আমি চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বললেন, "কোনও অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন। আমার এ বন্ধুটি খুব হেলপ্রফুল।

কলকাতায় ডিসেম্বরে বেশ শীত পড়লেও বম্বেতে নাকি তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না। আমাদের ছোট দুটো স্যুটকেসেই সব ম্যানেজ হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে উঠে দেখি কুয়াশায় রাস্তার ও পারে পন্টুদের বাড়িটা পর্যন্ত ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। প্লেন ছাড়বে তো? আশ্চর্য, নটার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠে গেল। ভি আই পি রোডে এমনিতেই শহরের চেয়ে বেশি কুয়াশা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম তেমন কিছু নয়।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম, তখন প্লেন ছাড়তে পঞ্চাশ মিনিট বাকি। লালমোহনবাবু আগেই হাজির। এমনকী বোর্ডিং কার্ডও দেখলাম উঁকি মারছে পকেট থেকে। বললেন, কিছু মনে করবেন না, ফেলুবাবু—লম্বা কিউ দেখে

ভাবলুম যদি জানলার ধারে সিট না পাই, তাই আগেভাগেই সেরে রাখলুম। এইচ রো—দেখুন হয়তো দেখবেন কাছাকাছি সিট পেয়ে গেছেন।

আপনার হাতে ওটা কী? কী বই কিনলেন?

লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হয়েছিল উনি নিজের বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে।

ফেলুদার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন, কিনব কি মশাই; সেই সান্যাল—সে দিন যার কথা বলেছিলাম—সে দিয়ে গেল এই মিনিট দশেক আগে।

উপহার?

নো স্যার। বম্বে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমার নাম-ধাম তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন এক আত্মীয়ের কাছে যাবে এ বই। তারপর একটু হেসে বললেন, ইয়ে—একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন না?

পাওয়া মুশকিল, বলল ফেলুদা, কারণ ভারত কেমিক্যালস-এর গুলবাহার সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে স্নান করে দিয়েছে।

গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম। সানাল মশাই এমনই সেন্ট মাখেন যে তার সুবাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে।

'যা বলেছেন স্যার, হ্যাঃ হাঃ', সায় দিলেন জটায়ু। 'তবে অনেক সময় শুনিচি, এইভাবে লোকে উলটাপালটা জিনিসও চালান দেয়।'

সে তো বটেই। বুকিং কাউন্টারে তো নোটিসই লাগানো আছে যে, অচেনা লোকের হাত থেকে চালান দেওয়ার জন্য কোনও জিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক। অবিশ্যি এ ভদ্রলোককে টেকনিক্যালি ঠিক অচেনা বলা চলে না, আর প্যাকেটটাও যে বইয়ের, সেটা সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছি না।

প্লেনে তিনজনে পাশাপাশি জায়গা পেলাম না; লালমোহনবাবু আমাদের তিনটে সারি পিছনে জানলার ধারে বসলেন। ফ্লাইটে বলবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। কেবল লাউডস্পিকারে ক্যাপ্টেন দত্ত যখন বলছেন আমরা নাগপুরের

উপর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পিছন ফিরে দেখি লালমোহনবাবু সিট ছেড়ে উঠে প্লেনের ল্যাজের দিকটায় চলেছেন। শেষটায় একজন এয়ার হোসটেস ওঁকে থামিয়ে উলটো দিকে দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে ককপিটে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এসে জিভ কেটে বা দিকের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। নিজের সিটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, আমার পাশের লোকটিকে এক ঝলক দেখে নাও। হাই-জ্যাকার হলে আশ্চর্য হব না।

মাথা ঘুরিয়ে দেখে বুঝলাম জটায়ু অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে না থাকলে ও রকম নিরীহ, নেই-থুতনি মানুষটাকে কক্ষনও হাই-জ্যাকার ভাবতেন না।

সান্টা ক্রুজে প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন। ডোমেসটিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় মিস্টার গাঙ্গুলী? শুনে ডাইনে ঘুরে দেখি গাঢ় লাল রঙের টেরিলিনের শার্ট পরা একজন লোক মাদ্রাজি টাইপের এক ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছে। ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত ভাবেই মাথা নেড়ে না বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল শার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আই অ্যাম মিস্টার গাঙ্গুলী অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম মিস্টার সানাল, এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়ু।

লাল শার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও কর্তব্য সেরে নিশ্চিন্তে হাত ঝাড়লেন।

আমাদের মাল বেরোতে লাগল আধ ঘণ্টা। এখন একটা বেজে কুড়ি, শহরে পৌছতে পৌছতে হয়ে যাবে প্রায় দুটো। পুলক ঘোষাল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, দেখলাম সেটা একটা গেরুয়া রঙের স্ট্যান্ডার্ড।

ড্রাইভারটি বেশ শৌখিন ও ফিটফট; হিন্দি ছাড়া ইংরেজিটাও মোটামুটি জানে। কলকাতার তিনজন অচেনা লোকের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনওরকম বিরক্তির ভাব দেখলাম না। বরং লালমোহনবাবুকে যে রকম একটা সেলাম ঠুকল, তাতে মনে হল কাজটা পেয়ে সে কৃতার্থ। ড্রাইভারই খবর দিল যে শহরের ভিতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে, আর পুলকবাবু বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। গাড়ি আমাদের জন্য রাখা থাকবে, আমরা যখন খুশি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি।

ফেলুদা অবিশ্যি এখানে আসবার আগে ওর অভ্যাস মতো বম্বে সম্বন্ধে পড়াশুনা করে নিয়েছে। ও বলে, কোনও নতুন জায়গায় আসার আগে এ জিনিসটা করে না নিলে নাকি সে জায়গা দূরেই থেকে যায়। মানুষের যেমন একটা পরিচয় তার নামে, একটা চেহারায়, একটা চরিত্রে আর একটা তার অতীত ইতিহাসে, ঠিক তেমনই নাকি শহরেরও। বম্বে শহরের চেহারা আর চরিত্র এখনও ফেলুদার জানা নেই, তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হল কেম্পস কর্নারের কাছে।

আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল—উয়ো যো ট্যাক্সি হ্যায় না—এম আর পি থ্রি ফাইভ থ্রি এইট—উসকো পিছে পিছে চলনা।

কী ব্যাপার মশাই? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

একটা সামান্য কৌতুহল, বলল ফেলুদা।

আমাদের গাড়ি একটা স্কুটারে আর দুটো অ্যাম্বাসাডরকে ছাড়িয়ে ফিয়াট ট্যাক্সিটার ঠিক পিছনে এসে পড়ল। এবার ট্যাক্সিটার পিছনের কাচ দিয়ে দেখলাম ভিতরে বসা লাল টেরিলিনের শার্ট।

একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুই হয়নি, কেন ফেলুদা ট্যাক্সিটাকে ধাওয়া করছে তাও জানি না, তবু ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে বলেই যেন একটা রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া লাগল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি আজকাল

ধরেই নিয়েছেন যে, ফেলুদার সব কাজের মানে জিজ্ঞেস করে সব সময়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না; যথাসময়ে আপনা থেকেই সেটা জানা যাবে।

আমাদের গাড়ি দিব্যি ট্যাক্সিটাকে চোখে রেখে চলেছে, আমরাও নতুন শহরের রাস্তাঘাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি। একটা জিনিস বলতেই হবে—হিন্দি ছবির এত বেশি আর এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আর কোনও শহরের রাস্তায় দেখিনি। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখে বললেন, সবাইয়ের নামই তো দেখছি, অথচ কাহিনীকারের নামটা কেন চোখে পড়ছে না। এরা কি গপ্প লেখায় না কাউকে দিয়ে?

ফেলুদা বলল, গল্প লেখক হিসেবে নাম যদি আশা করেন, তা হলে বম্বে আপনার জায়গা নয়। এখানে গল্প লেখা হয় না, গল্প তৈরি হয়, ম্যানুফ্যাকচার হয়—যেমন বাজারের আর পাঁচটা জিনিস ম্যানুফাকচার হয়। লাক্স সাবান কে তৈরি করেছে, তার নাম কি কেউ জানে?—কোম্পানির নামটা হয়তো জানে। টাকা পাচ্ছেন, ব্যস; মুখটি বন্ধ করে বসে থাকুন। সম্মানের কথা ভুলে যান।

হুঁ...। লালমোহনবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তা হলে মান হল গিয়ে আপনার রেঙ্গলে, আর বম্বেতে হচ্ছে মানি?

হক্ কথা, বলল ফেলুদা।

ফেলুদা যে-এলাকাটাকে মহালক্ষ্মী বলে বলল, সেটা ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে আমাদের মাকামারা ট্যাক্সিটা একটা ডান দিকের রাস্তা ধরল। আমাদের ড্রাইভার বলল যে, শালিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত।

ফেলুদা বলল, আপ দাঁয়া চলিয়ে। ডান দিকে ঘুরে মিনিট দু-এক যেতেই দেখলাম ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে একটা গেটের ভিতর ঢুকে গেল। ফেলুদার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই থামল। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম, আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু হিক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

SHIVAJI CASTLE
15 D

কারণটা পরিষ্কার। আমরা একটা বিরাট ঢাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি, তার তিনতলার হাইটে বড় বড় উঁচু উঁচু কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—শিবাজী কাস্‌ল।

৩

নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগল যে, কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলাম না। এ যে টেলিপ্যাথির ঠাকুরদাদা?—বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা চুপ। দেখলাম ও শুধু বাড়িটাই দেখছে না, তার আশপাশটাও দেখছে। বাঁ দিকে পর পর অনেকগুলো বাড়ি, তার কোনওটাই বিশ তলার কম না। ডান দিকের বাড়িগুলো নিচু আর পুরনো, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার একটু যেন অবাক হয়েই আমাদের হাবভাব লক্ষ করছিল। ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট তিনেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এল।

চলিয়ে শালিমার হোটেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খুব সম্ভবত সেভেনটিন্থ্ ফ্লোরে, অথাৎ আঠারো তলায় গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট।

আপনি যে ভেলকি দেখালেন মশাই, বললেন লালমোহনবাবু, এই তিন মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা, সেটা জেনে ফেলে দিলেন?

আঠারোতলায় গেছে কি না জানবার জন্য আঠারোতলায় ওঠার দরকার হয় না। এক তলার লিফটের মাথার উপরেই বোর্ডে নম্বর লেখা থাকে। যখন পৌঁছলাম, তখন লিফট উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শেষ যে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল, সেটা হল সতেরো। এবার বুঝেছেন তো?

লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলুম তো। এত সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই তো বুঝি না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌছে গেলাম। ফেলুদা আর আমার জন্য পাঁচ তলায় একটা ডাবল রুম, আর লালমোহনবাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উলটো দিকে একটা সিঙ্গল। আমাদের ঘরটা রাস্তার দিকে, জানালা দিয়ে নীচে চাইলেই অবিরাম গাড়ির স্রোত, আর সামনের দিকে চাইলে দুটো ঢাঙা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র। বম্বে যে একটা গমগমে শহর, সেটা এই ঘরে বসেই বেশ বোঝা যায়। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড; হাত-মুখ ধুয়ে তিনজনে গেলাম হোটেলেরই দোতলায় গুলমার্গ রেস্টোর‍্যান্টে। লালমোহনবাবুর ঠোঁটের ডগায় যে প্রশ্নটা এসে আটকে ছিল, সেটা খাবারের অর্ডার দিয়েই করে ফেললেন।

আপনিও তা হলে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন, ফেলুবাবু?

ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করল।

লোকটা আপনার হাত থেকে বইটা নিয়ে কী করল, সেটা লক্ষ করেছিলেন?

কেন?—চলে গেল! বললেন লালমোহনবাবু।

ওই তো! কেবল মোটা জিনিসটাই দেখেছেন, সূক্ষ্ম জিনিসটা চোখে পড়েনি। লোকটা খানিক দূর গিয়েই পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করেছিল।

টেলিফোন! আমি বলে উঠলাম।

ভেরি গুড, তোপসে। আমার বিশ্বাস লোকটা এয়ারপোর্টের পাবলিক টেলিফোন থেকে শহরে ফোন করে। তারপর আমরা যখন আমাদের মালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন লোকটাকে আবার দেখতে পাই।

কোথায়?

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার ঠিক বাইরেই প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা। মনে পড়ছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলে উঠলাম। লালমোহনবাবু চুপ।

লোকটা একটা নীল অ্যাম্বাসাডারে ওঠে। ড্রাইভার ছিল। পাঁচ-সাত মিনিট চেষ্টা করেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এসে ড্রাইভারের উপর তম্বি করে। কথা না শুনলেও, ভাবভঙ্গিতে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তারপর লোকটা গাড়ির আশা ছেড়ে চলে যায়।

ট্যাক্সি নিতে —এবার লালমোহনবাবু।

এগ্‌জাক্টলি—তাতে কী বোঝা যায়?

লোকটা ব্যস্ত—ইয়ে, ব্যতিব্যস্ত—ইয়ে, মানে, লোকটার তাড়া ছিল।

গুড। দৃষ্টি আর মস্তিষ্ক—এই দুটোকে সজাগ রাখলে অনেক কিছুই অনুমান করা যায়, লালমোহনবাবু। কাজেই আমি যে ট্যাক্সিটাকে ফলো করেছিলাম তার পিছনে একটা কারণ ছিল।

কী মনে হচ্ছে বলুন তো আপনার? লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসে কনুই দুটো টেবিলের উপর রেখে প্রশ্নটা করলেন।

এখনও কিছুই মনে হচ্ছে না, বলল ফেলুদা, শুধু একটা খটকা। এর পরে আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনও কথা বলিনি। পাঁচটা নাগাত বিশ্রাম-টিশ্রাম করে লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে এলেন। তিনজনে বসে চা আনিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা। যিনি ঢুকলেন তার বয়স পয়ত্রিশের বেশি

কিছুতেই নয়, কিন্তু মাথা ভরতি ঢেউ খেলানো চুলে আশ্চর্য বেশি রকম পাক ধরে গেছে।

এই যে লালুদা—কেমন, এভরিথিং অলরাইট?

লালুদা!—লালমোহনবাবুকে যে কেউ লালুদা ডাকতে পারে সেটা কেন জানি মাথাতেই আসেনি। বুঝলাম-ইনিই হচ্ছেন পুলক ঘোষাল। ফেলুদা আগেই লালমোহনবাবুকে শাসিয়ে রেখেছিল যে, ওর আসল পরিচয়টা যেন চেপে রাখা হয়। তাই পুলকবাবুর কাছে ও হয়ে গেল লালমোহনবাবুর বন্ধু। পুলকবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, দেখুন তো, আপনি লালুদার বন্ধু, এত কাছের মানুষ, আর আমরা হিরোর অভাবে হিমসিম খাচ্ছি। আপনার হিন্দি আসে?

ফেলুদা একটা খোলা হাসি হেসে বলল, হিন্দি তো আসেই না, অভিনয়টা আরওই আসে না। ...কিন্তু হিরোর অভাব কী রকম? আপনাদের তো শুটিং আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে শুনলাম। অর্জুন মেরহোত্রা করছে না?

তা তো করছে, কিন্তু অর্জুন কি আর সে-অর্জুন আছে? এখন তার হাজার বায়নাক্কা। এদের আমি হিরো বলি না মশাই। আসলে এরা চোরা ভিলেন, পদায় যাই হন না কেন। নাই দিয়ে দিয়ে এদের মাথাটি খেয়ে ফেলেছে এখানকার প্রোডিউসাররা। —যাক গে, পরশু আপনাদের ইনভাইট করে যাচ্ছি। এখান থেকে মাইল সত্তর দূরে শুটিং। ড্রাইভার জায়গা চেনে। সকাল সক্কাল বেরিয়ে সোজা চলে আসবেন। মিস্টার গোরে—মানে আমার প্রোডিউসার—এখানে নেই; ছবি বিক্রির ব্যাপারে দিন সাতেকের জন্য দিল্লি মাদ্রাজ কলকাতা ঘুরতে গেছেন। তবে উনি বলে গেছেন আপনাদের আতিথেয়তার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

কোথায় শুটিং? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

বিটউইন খাণ্ডালা অ্যান্ড লোনাউলি। ট্রেনের সিন। প্যাসেঞ্জারের অভাব হলে আপনাদের বসিয়ে দেব কিন্তু।

‘ভাল কথা’, লালমোহনবাবু বললেন, ‘আমরা শিবাজী কাসল দেখে এলুম।’

কথাটা শুনে পুলকবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল।

সেকী, কখন?

এই তো, আসার পথে। ধরুন, এই দুটো নাগাদ।

ও। তা হলে ব্যাপারটা আরও পরে হয়েছে।

কী ব্যাপার মশাই?

খুন।

সে কী! —আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। খ-য়ে হ্রস্বউ আর ন—এই দুটো পর পর জুড়লে আপনা থেকেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

আমি খবর পাই এই আধঘণ্টা আগে, বললেন পুলকবাবু। ও বাড়িতে তো আমার রেগুলার যাতায়াত মশাই! মিস্টার গোরেও শিবাজী কাস্থলেই থাকেন—বারো নম্বর ফ্লোরে। সাধে কি আপনার গল্পে বাড়ির নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে! অবিশ্যি উনি নিজে খুব মাই-ডিয়ার লোক। —আপনারা বাড়ির ভেতরে গেসলেন নাকি? আমি গিয়েছিলাম, বলল ফেলুদা, লিফটের দরজা অবধি। ওরেববাবা! লিফটের ভেতরেই তো খুন। লাশ সনাক্ত হয়নি এখনও। দেখতে গুণ্ডা টাইপ। তিনটে নাগাত ত্যাগরাজন বলে ওখানকারই এক বাসিন্দা তিন তলা থেকে লিফটের জন্য বেল টেপে। লিফট ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখেন এই কাণ্ড। পেটে ছোরা মেরেছে মশাই। হরিবল ব্যাপার।

ওই সময়টায় লিফটে কাউকে উঠতে-টুঠতে দেখেনি কেউ? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

লিফটের আশেপাশে কেউ ছিল না। তবে বিল্ডিং-এর বাইরে দুজন ড্রাইভার ছিল, তারা ওই সময়টায় পাঁচ-ছজনকে ঢুকতে দেখেছে। তার মধ্যে একজনের গায়ে লাল শার্ট, একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গায়ে খয়েরি রঙের—

ফেলুদা হাত তুলে পুলকবাবুকে থামিয়ে বলল, ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি, কাজেই আর বেশি বলার দরকার নেই।

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছে। সর্বনাশ!—ফেলুদা কি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে নাকি?

'এনিওয়ে', আশ্বাসের সুরে বললেন পুলক ঘোষাল, ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনিও না লালুদা। আপনার গপ্পে শিবাজী কাস্‌লে স্মাগলার থাকে লিখেছেন, তাতে আর ভয়ের কী আছে বলুন। বম্বের কোন অ্যাপার্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না? মিসায় আর কটাকে ধরেছে? এ তো সবে খোসা ছাড়ানো চলছে এখন, শাঁসে পৌছুতে অনেক দেরি। সারা শহরটাই তো স্মাগলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তবে সে ভাবটা কেটে গেল আর একজন লোকের আবির্ভাবে। দ্বিতীয় টোকার শব্দ হতে পুলকবাবুই চেয়ার ছেড়ে এই বোধহয় ভিক্‌টর বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। চাবুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন লোক ঘরে ঢুকল।

পরিচয় করিয়ে দিই লালুদা—ইনি হলেন ভিক্টর পেরুমল—হংকং-ট্রেনড কুং-ফু এক্সপার্ট।

ভদ্রলোক দিব্যি খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরজি বলেন, পুলকবাবু বললেন, আর হিন্দি তো বটেই, যদিও ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক। আর ইনি শুধু কুং-ফু শেখান না, এর স্টান্টেরও জবাব নেই। ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনের উপর লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা হিরোর ভাইয়ের মেক-আপ নিয়ে ইনিই করবেন।

আমার ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল। হাসিটার মধ্যে সত্যিই একটা খোলসা ভাব আছে। তার উপরে স্টান্টম্যান শুনে ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তিভাবও জেগে উঠল। যারা সামান্য কটা টাকার জন্য দিনের পর দিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, আর তার জন্য বাহবা নিয়ে যায় প্রক্সি-দেওয়া হিরোগুলো, তাদের সাবাস বলতেই হয়।

ভিক্টর পেরুমল বললেন, তিনি শুধু কুং-ফু-ই জানেন না— আই নো মোক্কাইরি অলসো।

মোক্কাইরি? সে আবার কী? ফেলুদার যে এত জ্ঞান, ও-ও বলল জানে না; আর লালমোহনবাবুর কথা তো ছেড়েই দিলাম, কারণ উনি নিজের লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন-টড়েন না।

পেরুমল বলল, মোক্কাইরি হচ্ছে নাকি এক-রকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শূন্যে তুলে হাতে হাঁটতে হয়। এটা নাকি হংকং-এ চালু হয়েছে মাত্র মাস ছয়েক হল, যদিও জন্মস্থান জাপান।

এটাও রয়েছে নাকি ছবিতে? লালমোহনবাবু যেন কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পুলক ঘোষাল হেসে মাথা নাড়লেন। এক কুং-ফু-র ঠেলাই আগে সামলাই। এগারোজন লোককে সকাল-বিকেল ট্রেনিং দিতে হচ্ছে সেই নভেম্বরের গোড়া থেকে। আপনি তো লিখে খালাস, ঝক্কি তো পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। অবিশ্যি আপনারা যে শুটিংটা দেখবেন, তাতে কুং-ফু নেই। এতে দেখবেন স্টান্টম্যানের খেলা। .ক্লাস ছবি হবে আপনার গপ্পো থেকে লালুদা—কুছ পরোয়া নেহি।

পুলক ঘোষাল আর ভিক্টর চলে যাবার পর ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্র্যাফিকের শব্দে ঘর ভরে গেল। অবিশ্যি পাঁচতলা হওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আসলে আমাদের কারুরই এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যেসও নেই, ভালও লাগে না। বাইরের শব্দ আসুক; তার সঙ্গে খাঁটি বাতাসটাও তো ঢুকছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে ফেলুদা একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল, লালমোহনবাবু, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা যে রকম উগ্র হয়ে উঠছে, সেটা বেশ অস্বস্তিকর। আপনি ওই প্যাকেটটা চালানের ভার না নিলেই পারতেন। আমি যদি তখন থাকতাম, তা হলে আপনাকে বারণ করতাম।

কী করি বলুন, লালমোহনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ভদ্রলোক বললেন, আমি এর পর যে গল্পটা লিখব সেটা যেন ওঁর জন্য রিজার্ভ করে রাখি। তারপরে আর কী করে না বলি বলুন।

ব্যাপারটা কী জানেন? এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি চেক হয়, তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা। আপনাকে নিরীহ মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করেনি। খুললে কী বেরোত কে জানে? ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে ওই খুনের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে?

বই মানেই যে বই তা তো নাও হতে পারে। আংটির মধ্যে বিষ রাখার ব্যবস্থা থাকত রাজাবাদশাদের আমলে, সেটা জানেন? সে আংটিকে শুধু আংটি বললে কি ঠিক হবে? আংটিও বটে, বিষাধারও বটে। ...যাক, আপনার কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে, তখন আপনার নিজের কোনও বিপদ নেই বলেই মনে হচ্ছে।

'বলছেন?' লালমোহনবাবুর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

বলছি, বইকী, ফেলুদা বলল। 'আর আপনার বিপদ মানে তো আমাদেরও বিপদ। এক সূত্রে বাধা আছি মোরা তিনজনায়। সুতোয় টান পড়লে তিনজনেই কাত।'

লালমোহনবাবু এক ঝটকায় খাট থেকে উঠে বাঁ পা-টাকে কুং-ফুর মতো করে শূন্যে একটা লাথি মেরে বললেন, থ্রি চিয়ারস ফর দ্য থ্রি মাসকেটিয়ারস। —হিপ হিপ—

ফেলুদা আর আমি লালমোহনবাবুর সঙ্গে গলা মেলালাম—

হুররে!

৪

সন্ধ্যা ছটা নাগাত আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না, এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি। যোধপুর, কাশী, দিল্লি, গ্যাংটক—সব জায়গাতেই আমরা এ জিনিসটা করেছি। বম্বেতেই বা করব না কেন?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কিছু দূর গেলেই যাকে কেম্পস কনার বলে, সেখানে একটা দুদান্ত ফ্লাই-ওভার পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাগড়াই থামের উপর দিয়ে ব্রিজের মতো রাস্তা, তার উপরেও ট্র্যাফিক, নীচেও ট্র্যাফিক। আমরা

ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি। ফেলুদা ডান দিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের গা দিয়ে হ্যাংগিং গার্ডনস যাবার রাস্তা। এই পাহাড়ের নামই মালাবার হিলস।

মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল। আপিস ফেরত গাড়ির স্রোত এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এক কোমর উচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচিলের পিছন দিকে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পুবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে, যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা নাকি ম্যারিন ড্রাইভ।

লালমোহনবাবু বললেন, স্মাগলারই বলুন আর যাই বলুন—পাহাড় আর সমুদ্র মিলিয়ে বম্বে একেবারে চ্যাম্পিয়ন শহর মশাই।

পাঁচিলের ধার দিয়ে আমরা ম্যারিন ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগলাম। বাঁ দিক দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর লালমোহনবাবু আর একটা মন্তব্য করলেন।

এখানে বোধহয় সি এম ডি এ নেই; আছে কি? রাস্তায় খানাখন্দ নেই বলে বলছেন তো? এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়ই লক্ষ করছিলুম যে, গাড়িতে চলেছি অথচ লাফাচ্ছি না। অবিশ্বাস্য?

কিছুক্ষণ থেকেই সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় ভিড় লক্ষ করছিলাম। যেমন রবিবার আমাদের শহিদ মিনারের নীচে হয়, অনেকটা সেই রকম। আরও কাছে যেতে ফেলুদা বলল জায়গাটার নাম চৌপাটি। এখানে রোজই নাকি রথের মেলার মতো ভিড় হয়। সার-বাঁধা দোকান, দেখেই মনে হয় ফুচকা বা ভেলপুরি বা আইসক্রিম বা ওই জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছে।

ক্রমে কাছে এসে বুঝলাম আন্দাজে ভুল করিনি। মেলার মতো মেলা বটে। অর্ধেক বম্বে শহর ভেঙে পড়েছে এখানে। লালমোহনবাবু শিগগিরই রিচ

ম্যান হচ্ছেন, তাই ওঁর ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই। তিনজনে হাতে ভেলপুরির ঠোঙা নিয়ে ভিড় আর হই-হুল্লোড় ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসলাম। ঘড়িতে পৌনে সাতটা, কিন্তু এখনও আকাশে গোলাপি রং। আমাদের মতো অনেকেই বালির উপর বসে আরাম করছে। লালমোহনবাবু খাওয়া শেষ করে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাঁ দিকে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে কারুর হাত থেকে একটা খবরের কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকের মুখের উপর লেপটে গিয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সবে ইভনিং নিউজ কথাটা বলেছেন, এমন সময় ফেলুদা তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

নামটা পড়লেন, আর তার নীচে হেড-লাইনটা চোখে পড়ল না? আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। হেডলাইন হচ্ছে—মাডার ইন অ্যাপার্টমেন্ট লিফট, আর তার নীচেই যে খুন হয়েছে তার ছবি। যাক—এ তা হলে আমাদের লালশার্ট নয়।

খবরে বলছে, খুনটা হয়েছে দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে। খুনি এখনও ধরা পড়েনি, তবে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে খুন হয়েছে তার নাম মঙ্গলরাম শেঠী। চোরাকারবারিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বেশ কিছু দিন থেকেই পুলিশ খুঁজছে। লিফটে বেশ ধ্বস্তাধস্তি হয়েছিল তারও নাকি প্রমাণ পাওয়া গেছে। কুয়ের মধ্যে নাকি এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে। কাগজে একজনের নাম ছিল। নামটা হচ্ছে—

ও আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ...

একটা অদ্ভুত গোঙানি-টাইপের শব্দ লালমোহনবাবুর গলা দিয়ে বেরোল। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন মনে করে আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে জাপটে ধরলাম। অবিশ্যি এ রকম করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইভনিং নিউজ লিখছে চিরকুটে লেখা ছিল—মিস্টার গাঙ্গুলী, ডার্ক, শর্ট, বল্ড, মুসটাশ।

খবরটা পড়া শেষ হওয়া মাত্র লালমোহনবাবু ফেলুদার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন।

ফেলুদা বলল, এমন পরিষ্কার সমুদ্রতটটিকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিলেন? ভদ্রলোক এখনও ভাল করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেলুদা এবার ধমকের সুরে বলল, আপনার কি ধারণা, গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুঝে ফেলবে যে আপনিই হচ্ছেন এই ব্যক্তি?

লালমোহনবাবু এতেও সান্ত্বনা পেলেন না। কোনওরকমে ঢোক গিলে বললেন, কিন্তু—কিন্তু—এর মানেটা বুঝছেন তো? কে খুন করেছে, বুঝছেন তো?

ফেলুদা বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, লালুদা, চার বছর আমার সংসর্গ-লাভ করেও মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে শিখলেন না।

কেন, কেন—লালশার্ট—? লালশার্ট কী? কাগজটা লালশার্টেরই হাত থেকে লিফটে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে? তার মানেই যে সে খুন করেছে তার কী প্রমাণ? আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ—এটা তো ঠিক? তা হলে কাগজটারও তার আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। লিফটে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে, সে সেটা লিফটেই ফেলে দিল—এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

লালমোহনবাবু তবুও ঠাণ্ডা হলেন না। 'আপনি যাই বলুন, লাশের পাশে যখন আমার নাম আর ডেসক্রিপশন লেখা কাগজ পেয়েছে, তখন আমার চরম ভোগান্তি আছে—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা একটাই। টাকে তো আর চুল গজাবে না, হাইটও বাড়বে না, আর কমপ্লেকশনও চেঞ্জ হবে না। আছে এক গোঁফ। আপনি যাই বলুন, এ গোঁফ আমি কালই হাওয়া করে দেব।'

আর হোটেলের লোকেরা কী ভাববে? তারা কি আর ইভনিং নিউজ পড়েনি ভেবেছেন? খুনের খবর শতকরা নববুই ভাগ লোকে পড়বে, মানুষের

স্বভাবই ওই। আমার ধারণা আপনি গোঁফ ছাঁটলে দৃষ্টিটা, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা, আরও বেশি করে আপনার উপর পড়বে।

আকাশের লালটা যখন বেগুনি হয়ে শেষে পাংশুটের দিকে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমের চেরা মেঘের ফাঁকে শুকতারাটা পুবের ম্যারিন ড্রাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে গিয়ে ধুকপুক করছে, তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলমুখো হলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা যেদিকে বাড়ালেন, মুখটা তার উলটোদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, উলটোদিকে লবিতে বসা সাতজন দেশি-বিদেশি লোকের তিনজনের হাতে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খুনের খবর আর মৃতদেহের ছবি। খবরের মধ্যে টেকো বেঁটে গুফো রং-ময়লা মিস্টার গাঙ্গুলীর উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না।

৫

লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গোঁফটা কামাননি। রাত্রে ঘুম হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করাতে বললেন যতবারই চোখ টুলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ওঁর ঘরটা লিফটের মতো ওঠানামা করছে, আর তার ফলে তন্দ্রা ছুটে গেছে।

পুলকবাবু কাল রাত্রেই ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিয়োতে নিয়ে যাবেন। আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিকদূরে হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিব্যি

মিঠে পান কিনে পৌনে নটায় হোটেলে ঢুকতেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

কারণ আর কিছুই না, পুলিশ এসেছে। একজন ইনস্পেক্টর গোছের লোক কাউনটারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, হোটেলের কর্মচারী একটা ইঙ্গিত করতেই তিনি ঘুরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। ইনস্পেক্টরের চাহনিতে যদিও কোনও হুমকির ভাব ছিল না, পাশে একটা খট্ শব্দ শুনে বুঝলাম লালমোহনবাবুর দুটো হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে।

ইনস্পেক্টর হাসিমুখে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—নাভাস হবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ইনস্পেক্টর পটবর্ধন। সি আই ডি থেকে আসছি। আপনি মিস্টার গাঙ্গুলী?

হাঁয়েস।

এই রে, লালমোহনবাবু ইংরিজি-বাংলা গুলিয়ে ফেলেছেন।

পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন।

আপনারা—?

ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর লেখা কার্ডটা বার করে দিল। পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

মিটার? আপনিই কি এলোরার সেই মূর্তি চুরির—?

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

গ্র্যাড টু মিট ইউ স্যার, হাত বাড়িয়ে বললেন পটবর্ধন। 'ইউ ডিড এ ভেরি গুড জব দেয়ার।'

ফেলুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুর খাতির বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জেরার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। কথা হল হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসে।

পটবর্ধন যা বললেন তাতে জানলাম যে মৃতদেহের গায়ে নাকি অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তবে খুনি এখনও ধরা পড়েনি। কিন্তু একজন লালশার্ট পরা লোক যে এয়ারপোর্ট থেকে শিবাজী ক্যাস্‌ল-এ এসেছিল সেটা পুলিশ বার করেছে ট্যাক্সিওয়ালাটার সন্ধান বার করে। পুলিশের ধারণা এই লালশার্টই খুনি এবং তার পকেট থেকেই চিরকুটটা বেরিয়েছে। লালমোহনবাবুর কথা শুনে অবিশ্যি পটবর্ধনের ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। বললেন, এটা বুঝতেই পারছিলাম যে লোকটা গাঙ্গুলী নামে কাউকে মিট করতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। আমরা গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে যত প্লেন স্যান্টাক্রুজে নেমেছে, তার প্রত্যেকটার প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে ক্যালকাটা ফ্লাইটে গাঙ্গুলী নামটা পাই। তারপর এখানে প্রত্যেক হোটেলে খোঁজ করি। দেখলাম শালিমার হোটলে দুপুরে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গলী।

পটবর্ধনের আসল যেটা জানার ছিল, সেটা হচ্ছে এই ব্যাপারে লালমোহনবাবুর ভূমিকাটা কী; অর্থাৎ ওই কাগজে তার নাম আর চেহারার বর্ণনা থাকবে কেন। লালমোহনবাবু মিস্টার সান্যালের ব্যাপারটা বলাতে পটবর্ধন বললেন, হু ইজ দিস সানিয়াল? হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম?

লালমোহনবাবু যা বলবার বললেন। সান্যালের ঠিকানা জিজ্ঞেস করাতে বাধ্য হয়েই বলতে হল উনি জানেন না।

সবশেষে ইনস্পেক্টর পটবর্ধন ঠিক ফেলুদার মতো করেই সাবধান করে দিলেন লালমোহনবাবুকে। বললেন, ঠিক এইভাবেই নিরীহ নিদোষ লোকের হাত দিয়ে আজকাল চোরাই মাল পাচার হচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে কিছু দামি মণিমুক্তো এদেশে এসেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। শুনছি, তার মধ্যে নাকি নানাসাহেবের বিখ্যাত নওলাখা হারও আছে।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় একজন নানাসাহেব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ইতিহাসে পড়েছি। পটবর্ধন সেই নানাসাহেবের কথা বলছেন কি না জানি না।

আমার বিশ্বাস এই প্যাকেটটাতেও কোনও চোরাই মাল ছিল, বললেন পটবর্ধন। যে গ্যাং এটা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে, তারই বিরুদ্ধ গ্যাঙের কেউ খবর পেয়ে শিবাজী কাস্লের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সেই লোকই লালশার্টকে আক্রমণ করে, ফলে লালশার্টের হাতে তার মৃত্যু হয়।

লালমোহনবাবু ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর নাম-লেখা কাগজ পুলিশের হাতে পড়াতে ওঁর ফাঁসি না-হয় যাবজীবন দ্বীপান্তর হবেই। কেবল কয়েকটা উপদেশ-বাক্য শুনে ছাড়া পেয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোকের চেহারায় নতুন জেল্লা এসে গেল।

পুলকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগারোটায়। পুলিশের ব্যাপারটা শুনে বললেন, আর বলবেন না—কাল কাগজ দেখেই বুকটা ছাৎ করে উঠেছে। লালুদার সঙ্গে নাম-ডেসক্রিপশন সব মিলে যাচ্ছে, অথচ পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য।

সান্যালের ঘটনাটা শুনে বললেন, কোন সান্যাল বলুন তো? অহী সান্যাল? মাঝারি হাইট, চোখদুটো একটু বসা, থুতনিতে খাঁজ কাটা?

থুতনি তো দেখিনি ভাই। দাড়ি আছে। বোধহয় আগে রাখতেন না।

আমি দু বছর আগের কথা বলছি। একই লোক কি না জানি না। বোম্বেতে ছিল কিছু দিন। ছবিও প্রোডিউস করেছিল খান দু-এক মার খেয়েছিল—যদ্দূর মনে পড়ে।

লোক কী রকম?

সে খবর জানি না লালুদা, তবে বদনাম শুনিনি কখনও।

তা হলে বোধহয় কাগজের প্যাকেটে কোনও গোলমাল নেই।

দেখুন লালুদা, আজকাল নেহাত স্মাগলিং-টাগলিং হচ্ছে বলে, নইলে আমরাও তো এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌছে দিয়েছি। কই, কোনওদিন তো কোনও গোলমাল হয়নি।

যে গাড়িটা কাল ব্যবহার করেছিলাম, সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর ফেমাস স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হলাম। গাড়ি থেকে নামবার সময় পুলকবাবু বললেন, আগামী কালের শুটিং-এ ট্রেনের ব্যাপারটায় রেল কোম্পানির লোকদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। খবরটা পেয়েই প্রোডিউসার রাত্তিরের প্লেন ধরে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কালকের শুটিংটা হবে তো? লালমোহনবাবুর গলায় আশঙ্কার সুর।

শুটিং-এর ফাদার হবে লালুদা, ঘাবড়াইয়ে মৎ।

আমরা একটা টিনের ছাতওয়ালা কারখানার ঘরের মতো বিরাট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এখানেই শুটিং হয়, আর আজ এখানেই চলেছে কুং-ফুর ট্রেনিং। একটা প্রকাণ্ড গদির উপর ভিক্টর পেরুমলের নির্দেশে একদল লোক লাফাচ্ছে, পা ছুড়ছে, আছাড় খাচ্ছে। গদি থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একজন বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক।

আলাপ করিয়ে দিই, বললেন পুলকবাবু, ইনি হচ্ছেন আমাদের ছবির প্রযোজক মিঃ গোরে.মিস্টার গাঙ্গুলী, স্টোরি রাইটার—মিস্টার মিত্র, আর—তোমার নামটা কী ভাই?

তপেশরঞ্জন মিত্র।

মিঃ গোরের গাল দুটো আপেলের মতো, মাথার ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে টাক, আর চোখদুটো সামান্য কটা। ভুঁড়িটা নিশ্চয়ই ইদানীং হয়েছে, কারণ শখ করে এত টাইট জামা কেউ পরে না। পুলকবাবু আলাপ করিয়ে দিয়ে

হাওয়া, কারণ কালকের শুটিং-এর নাকি অনেক তোড়জোড় আছে। বলে গেলেন, দেড়টায় ফিরছি লালুদা; আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন আপনারা।

গোরে আমাদের খুব খাতির-টাতির করে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিজে লালমোহনবাবুর পাশে বসে বললেন, আপনি এলেন বলে আমি খুব খুশি হলাম।

সে কী, আপনি তো দিব্যি বাংলা বলেন! লালমোহনবাবু বোধহয় তাঁর দশ হাজার পাওনার কথাটা ভেবেই একটু বেশি খুলে তারিফ করলেন।

আমার ফাদারের বিজনেস ছিল ক্যানিং স্ট্রিটে। থ্রি ইয়ারস আই ওয়জ এ স্টুডেন্ট ইন ডন বস্‌কো। দেন ফাদারের ডেথ হল, আমি আঙ্কেলের কাছে চলে এলাম বুম্বই। সে তখুন থেকেই আই আম হিয়ার। লেকিন ফিলিম লাইনে দিস ইজ মাই ফাস্ট ভেনচার।

গোরে বাংলা জানেন দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে সান্যাল থেকে শুরু করে আজকের পুলিশের জেরা অবধি সব ঘটনা ভদ্রলোককে বলে ফেললেন। তাতে মিঃ গোরে চুকচুক শব্দ করে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, আজকাল কাউকে বিসোয়াস করা যায় না, মিস্টার গাঙ্গুলী। আপনি এমিনেন্ট রাইটার, আপনার হাতে চোরাই মাল পাচার হবে ভাবতে শরম লাগে।

এবার ফেলুদাও যোগ দিল কথায়।

আপনি তো শিবাজী কাস্‌লে থাকেন বলে শুনলাম।

হাঁ। দুমাস হল আছি। হরিব্‌ল মার্ডার। ইভনিং ফ্রাইটে এসেছি আমি। বাড়ি ফিরেছি রাত ইগারটা। অ্যাট দ্যাট টাইম অলসো দেয়ার ওয়জ এ বিগ ক্রাউড ইন দ্য স্ট্রিট। হাই-রাইজ বিল্ডিংমে খুনখারাবি হোনেসে বহুং হুজ্জৎ।

ইয়ে—সেভেনটিনথ ফ্লোরে কে থাকে জানেন?

‘সেভেনটিনথ...সেভেনটিনথ... ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না। আমার চিনা আদমি এক হ্যায় এইটথ মে—এন সি মেহতা; আউর দো মে ডক্টর ভাজিফদার। মাই ফ্ল্যাট ইজ অন টুয়েলফথ ফ্লোর।

ফেলুদা আর কোনও প্রশ্ন করল না। মিঃ গোরেরও দেখলাম উঠি-উঠি ভাব। বললেন বহুৎ ঝামেলার প্রোডাকশন, সব সময় কিছু না কিছু কাজ লেগেই থাকে। তা ছাড়া কালকের শুটিংটা সত্যিই এলাহি ব্যাপার। মাথেরান স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন খাণ্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি লেভেল ক্রসিং-এ আসবে। মিঃ গোরে মাথেরানেই থাকবেন, কারণ রেল কোম্পানিকে পয়সাকড়ি দেওয়ার ব্যাপার আছে। একটা পুরনো আমলের ফাস্ট-ক্লাস কামরা থাকবে ট্রেনে, মিঃ গোরে সেই কামরায় চেপেই শুটিং-এর জায়গায় আসবেন। ‘আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লাঞ্চ করেন। আপনারা ভেজিটেরিয়ান কি?’

নো নো, নন নন, বললেন লালমোহনবাবু।

হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? চিকেন আর মটন?

চিকেন হ্যাড ইয়েসটারডে। মাটনই হোক টুমরো; কী বলেন, ফেলুবাবু?

তথাস্তু, বলল ফেলুদা।

ফেলুদা মিস্টার গোরের সব কথাই শুনছিল, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখটা যে বারবার কুং-ফুর দিকে চলে যাচ্ছিল, সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ভিক্টর পেরুমলের ধৈর্য আর অধ্যবসায় দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাপারটাকে নিখুঁত না করে সে ছাড়বে না। যারা শিখছে, তাদের মধ্যে দু-একজন দেখলাম রীতিমতো তৈরি হয়ে গেছে।

পেরুমলকেও দেখছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদার চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করছিল। গোরে চলে যাবার পর পেরুমল ফেলুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। ফেলুদা হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল।

আইয়ে মিস্টার মিত্রা—ট্রাই কিজিয়ে—ইটস নট সো ডিফিকাল্ট।

বাকি যারা ট্রেনিং নিচ্ছিল, তারা গদি ছেড়ে সরে গেল। পেরুমল একটা ছোট্ট লাফের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে ডান পা-টা মাথা অবধি তুলে সোজা সামনের দিকে ছিটকে দিল। পায়ের সামনে কেউ থাকলে নিঘাত ধরাশায়ী হত। ফেলুদা গদির উপর উঠে পাঁচ-ছ বার ছোট্ট ছোট্ট লাফ দিয়ে শরীরটাকে তৈরি করে নিল। পেরুমল ফেলুদার থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার দিকে ছোঁড়ো পা।

পেরুমলের জানার কথা নয় যে, এনটার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকে মাস কয়েক ধরে প্রায়ই সকালে ফেলুদা আমাদের বৈঠকখানায় কুং-ফুর ঢঙে হাত পা ছোঁড়া অভ্যেস করেছে। ফুর্তি ছাড়া এর পিছনে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পা ছোঁড়ার কায়দাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান-টু-থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ডান পা-টা হোরাইজন্ট্যালভাবে বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে ছিটকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পেরুমলের শরীরটা পিছনে ছিটকে গিয়ে আছাড় খেল গদির উপর—যদিও আমি জানি যে ফেলুদার পা তার গায়ে লাগেনি।

তারপর এইভাবে পাঁচ মিনিট ধরে চলল ভিক্টর পেরুমল আর প্রদোষ মিত্তিরের কুং-ফুর ডেমনস্ট্রেশন। আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পেরুমলের সাকরেদদের দিকে—দেড় মাস ধরে লাফ-ঝাঁপ করে যাদের জিভ বেরিয়ে এসেছে। এটা দেখে ভাল লাগল যে, হিংসার চেয়ে প্রশংসার ভাবটাই তাদের মুখে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটের শেষে যখন দুজনে হ্যান্ডশেক করে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তখন সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।

৬

দুটো নাগাদ পুলকবাবু আর সংলাপ-লেখক ত্রিভুবন গুপ্তের সঙ্গে আমরা ওয়রলির কপার চিমনি রেস্টোর‍্যান্ট লাঞ্চ খেতে ঢুকলাম। দেখে মনে হয় তিলধরার জায়গা নেই, কিন্তু পুলকবাবু আমাদের জন্য একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন।

লালমোহনবাবু বললেন, আমাদের ছবির নামটা কী হচ্ছে ভাই পুলক?

নামের কথাটা অবিশ্যি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগটা আসেনি। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

আর বলবেন না লালুদা, বললেন পুলকবাবু। ‘নাম নিয়ে কি কম হুজ্জত গেছে? যা ভাবি, তাই দেখি হয় হয়ে গেছে, না হয় অন্য কোনও পার্টি রেজিস্ট্রি করে বসে আছে। গুপ্তেজিকে জিজ্ঞেস করুন না, কত বিনিদ্র রজনী গেছে ওঁর নাম ভেবে বার করতে। শেষটায় এই তিনদিন আগে—যা হয় আর কী—হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক। ’

হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক? ছবির নাম হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক? লো-ভোল্টেজ গলার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

পুলকবাবু হো-হে করে হেসে চারিদিকের টেবিলের লোকদের মাথা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, মাথা খারাপ লালুদা? ও নামে ছবি চলে? আমি ইনস্পিরেশনের কথা বলছি। জেট বাহাদুর।

অ্যাঁ?

জেট বাহাদুর। রাস্তায় হোর্ডিং পড়ে যাবে আপনারা থাকতে থাকতেই। ভেবে দেখুন—আপনার গল্পের এর চেয়ে ভাল নাম আর খুঁজে পাবেন না। অ্যাকশন, স্পিড, থ্রিল—জেট কথাটার মধ্যে আপনি সব পাবেন। প্লাস বাহাদুর। নাম আর কাস্টিং-এর জোরেই আল সার্কিটস সোল্ড।

লালমোহনবাবুর হাসির ভোল্টেজটা যেন বাড়তে গিয়ে কমে গেল। বোধহয় ভাবছেন—শুধুই নাম আর কাস্টিং? গল্পের কি তা হলে কোনও দামই নেই?

আমার কোনও ছবি আপনারা দেখেছেন, লালুদা? বললেন পুলকবাবু। ‘তীরন্দাজটা হচ্ছে লোটাসে। আজ ইভনিং শো-এ দেখে আসুন। আমি ম্যানেজারকে বলে দেব—তিনখানা সার্কলের টিকিট রেখে দেবে। ভাল ছবি—জুবিলি করেছিল। ’

আমরা পুলকবাবুর কোনও ছবি দেখিনি। লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতুহল ছিল, তাই যাব বলেই বলে দিলাম। বম্বেতে চেনাশোনা না

থাকলে সন্ধে কাটানো ভারী মুশকিল। গাড়িটা আমাদের কাছেই থাকবে—তাকে বললেই লোটাসে নিয়ে যাবে।

খাবার মাঝখানে রেস্টোর‍্যান্টের একজন লোক পুলকবাবুকে এসে কী যেন বলল। পুলকবাবুর যে এখানে যাতায়াত আছে, সেটা ঢোকার সময় ওয়েটারদের মুখে হাসি দেখেই বুঝেছি। হিট ডিরেক্টারের এ শহরে খুব খাতির।

পুলকবাবু কথাটা শুনেই লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

আপনার টেলিফোন, লালুদা।

লালমোহনবাবু ভাগ্যিস পোলাওয়ের চামচটা মুখে পোরেননি, তা হলে নিঘাত বিষম খেতেন। এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খানিকটা পোলাও চামচ থেকে ছিটকে টেবিলের চাদরে পড়ার উপর দিয়ে গেল।

মিস্টার গোরে ডাকছেন, বললেন পুলকবাবু। হয়তো কিছু গুড নিউজ থাকতে পারে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে টেলিফোন সেরে এসে লালমোহনবাবু আবার কাঁটাচামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, চারটের সময় ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে বললেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে—হে হে।

তার মানে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর পকেটে দশ হাজার টাকা এসে যাবে। ফেলুদা বলল, এর পরের দিন লাঞ্চটা আপনার ঘাড়ে। আর কপার-টপার নয়, একেবারে গোল্ডেন চিমনি।

রুমলি রুটি, পোলাও, নারগিসি কোফত আর কুলপি খেয়ে যখন রেস্টোর‍্যান্ট থেকে বেরোলাম, তখন প্রায় পৌনে তিনটে। পুলকবাবু আর মিস্টার গুপ্তে স্টুডিয়ো চলে গেলেন। সংলাপ এখনও কিছু লিখতে বাকি আছে। প্রত্যেকটা সংলাপ শানিয়ে লিখতে হয় তো, তাই নাকি সময় লাগে, বললেন পুলকবাবু। গুপ্তেজি চুরুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ভদ্রলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন, সেটা লক্ষ করলাম।

আমরা পান কিনে গাড়িতে উঠলাম। 'শালিমার?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল। ফেলুদা বলল, বম্বে এসে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া না দেখে যাওয়া যায় না। —চলিয়ে তাজমহল হোটেলকা পাস।

'বহুৎ আচ্ছা।

ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোনও কাজ নেই, কেবল শহর দেখার ইচ্ছে, তাই সে দিব্যি ঘুরিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ফ্লোরা ফাউনটেন, টেলিভিশন স্টেশন, প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে পৌছল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

পিছনে আরব্য সাগর, তাতে গুনে দেখলাম এগারোটা ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রাস্তাটা পেল্লায় চওড়া। বাঁ দিকে গেটওয়ের দিকে মুখ করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজী। ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী-বিখ্যাত তাজমহল হোটেল, যার ভিতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোনও মানে হয় না, কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

ঠাণ্ডা লবিতে ঢুকে চোখ একেবারে টেরিয়ে গেল। এ কোন দেশে এলাম রে বাবা! এত রকম জাতের এত লোক একসঙ্গে কখনও দেখিনি। সাহেবদের চেয়েও দেখলাম আরবদের সংখ্যা বেশি। এটা কেন হল? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে আরবরা সব বোম্বাই এসেছে ছুটি ভোগ করতে। পেট্রোলের দৌলতে এদের তো আর পয়সার অভাব নেই।

মিনিট পাঁচেক পায়চারি করে আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। যখন শিবাজী কাস্‌লের লিফটের বেল টিপছি, তখন ঘড়িতে চারটে বেজে দু মিনিট।

টুয়েলফথ ফ্লোর বা তেরোতলায় পৌছে লিফট থেকে বেরিয়ে দেখি, তিন দিকে তিনটে দরজা। মাঝেরটার উপর লেখা জি গোরে। বেল টিপতে উর্দি-পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

অন্দর আইয়ে।

বুঝলাম, গোরে সাহেব চাকরকে আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা। ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে চোখে দেখার আগে তার গলা পেলাম—আসুন, আসুন! এই বার দেখা গেল একটা সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

হাউ ওয়জ দি লাঞ্চ?

ভেরি ভেরি গুড, বললেন জটায়ু। ভদ্রলোকের বৈঠকখানা দেখে তাক লেগে গেল। আমাদের কলকাতার বাড়ির প্রায় পুরো একতলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। পশ্চিম দিকটায় সারবাঁধা কাচের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের এক একটারই দাম হয়তো দু-তিন হাজার টাকা, তা ছাড়া মেঝে-জোড়া কার্পেট, দেওয়ালে পেন্টিং, সিলিং-এ ঝাড়-লণ্ঠন—এ সব তো আছেই। এক দিকে দেওয়ালজোড়া বুকশেলফে দামি দামি বইগুলো এত ঝকঝকে যে, দেখলে মনে হয় বুঝি এইমাত্র কেনা।

আমি আর ফেলুদা একটু পুরু গড়িওয়ালা সোফাতে পাশপাশি বসলাম, আর আমাদের ডান পাশে আর একটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। ফেলুদা হাত বাড়িয়ে তুড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এল। ও পরে বলেছিল যে, কুকুরটা জাতে হল গ্রেট ডেন।

ডিউক, ডিউক?

কুকুরটা এবার ফেলুদাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিঃ গোরে আমাদের বসিয়ে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্য পাশের চেয়ারে বসলেন।

আমি আপনার বেপারটা রেডি করে রাখব ভেবেছিলাম, বললেন মিঃ গোরে, 'কিন্তু তিনটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল।'

ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। মনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একতাড়া একশো টাকার নোট।

গিনতি করিয়ে লিন, বললেন মিঃ গোরে।

গিনব?

আবার ভাষার গণ্ডগোল।

গিনবেন আলবৎ। দেয়ার শুড বি ওয়ান হান্ড্রেড নোটস দেয়ার।

যে সময়ে লালমোহনবাবু গোনা শেষ করলেন, তার মধ্যে রুপোর টি-সেটে আমাদের জন্য চা এসে গেছে। খেয়ে বুঝলাম একেবারে সেরা দার্জিলিং টি।

আপনার পরিচয় আভি তক মিলল না, গোরে বললেন ফেলুদার দিকে চেয়ে।

ফেলুদা বলল, মিস্টার গাঙ্গুলীর ফ্রেন্ড—এই আমার পরিচয়।

নো স্যার, বললেন গোরে, দ্যাট ইজ নট এনাফ। ইউ আর নো অর্ডিনারি পারসন—আপনার চোখ, আপনার ভয়েস, আপনার হাইট, ওয়ক, বডি—নাথিং ইজ অর্ডিনারি। আপনি হামাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে। লেকিন স্রিফ মিস্টার গাঙ্গুলীর দোস্ত যদি বলেন, উ তো হামি বিসোয়াস করব না।

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেলল।

আপনার অনেক বই আছে দেখছি।

হাঁ—বাট আই ডোন্ট রিড দেম! উ সব কিতাব ওনলি ফর শো। তারাপোরওয়ালা দুকানে রেগুলার অডার—এনি গুড বুক দ্যাট কামস আউট—এক কপি হামাকে পাঠিয়ে দেয়।

একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি।

চোখ বটে ফেলুদার। ওই সারি সারি বিলিতি বইয়ের মধ্যে পনেরো হাত দূর থেকে ধরে ফেলেছে যে, একটা বই বাংলা।

মিঃ গোরে হেসে উঠলেন। শুধু বাংলা কেন মিঃ মিটার, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, সব আছে। আমার এক আদমি আছে—বাংলা হিন্দি গুজরাটি তিন ভাষা জানে; ও-ই তিন ভাষায় নভেল পড়ে হামাকে সিনপসিস করে দেয়। মিঃ গাঙ্গুলীর কিতাব কে ভি আউটলাইন পড়িয়েছি আমি। ইউ সি, মিস্টার মিটার, ফিল্ম বানানেকে লিয়ে তো—

ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছে। মিঃ গোরে উঠে গেলেন। দরজার পাশে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোন।

হ্যালো...হাঁ...হোল্ড অন। —আপনার টেলিফোন, মিস্টার গাঙ্গুলী।

লালমোহনবাবুকে বার বার এভাবে চমকাতে হচ্ছে—আশা করি তাতে ওঁর হার্ট-টার্টের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।

পুলকবাবু কি? টেলিফোনের দিকে যাবার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

নো স্যার, বললেন মিঃ গোরে। 'আই ডোন্ট নো দিস পারসন।'

হ্যালো।

ফেলুদা আড়চোখে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে।

হ্যালো... হ্যালো...

লালমোহনবাবু ভাবাচ্যাক ভাব করে আমাদের দিকে চাইলেন।

কেউ বলছে না কিছু।

লাইন কাট গিয়া হোগা, বললেন মিস্টার গোরে।

লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। অন্য সব শব্দ পাচ্ছি টেলিফোনে।

এবার ফেলুদা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল।

হ্যালো, হ্যালো...

ফেলুদা মাথা নেড়ে ফোন রেখে বলল, ছেড়ে দিয়েছে।

আশ্চর্য, বললেন লালমোহনবাবু, 'কে হতে পারে, বলুন তো?'

ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিস্টার গাঙ্গুলী, বললেন মিঃ গোরে। বোম্বাই শহরে এই রকম হামেশা হয়।

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুর পকেটে এত টাকা বলেই বোধহয় রহস্যজনক ফোনের ব্যাপারটা ওঁকে ততটা ভাবাল না। বেশ নিশ্চিন্তভাবেই ভদ্রলোক পরের কথাটা বললেন মিঃ গোরেকে।

আমরা আজ পুলকবাবুর ফিলিম দেখতে যাচ্ছি লোটাসে।

হাঁ, হাঁ যাবেন বইকী। ভেরি গুড ডিরেক্টার পুলকবাবু। জেট বাহাদুর ভি বকস অফিস হিট হোগা জরুর।

দরজার মুখ পর্যন্ত এলেন মিঃ গোরে। ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট লাঞ্চ টুমরো। ট্রানসপোর্ট আছে তো আপনাদের সঙ্গে?

আমরা আশ্বাস দিলাম যে, সকাল থেকে রাত অবধি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পুলকবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিফটের বোতাম টিপে ফেলুদা বলল, মানি কাকে বলে দেখলেন তো লালমোহনবাবু?

দেখলাম কি মশাই, তার খানিকটা তো আমার পকেটেই রয়েছে।

নস্যি, নস্যি। লাখ টাকাও এদের কাছে নস্যি। টাকাটা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিল না, সেটা দেখলেন তো? তার মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে কিন্তু। অথাৎ এই আপনার অন্ধকারে পদার্পণ শুরু।

ঘড়াং শব্দে লিফটটা উপরের কোনও ফ্লোর থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে থামল।

সে আপনি যাই বলুন ফেলুবাবু, পকেটে টাকা এলে তা সে কালোই হোক, আর—

ফেলুদা লিফটে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিল, আর তার ফলেই জটায়ুর কথা বন্ধ।

লিফটের ভিতর থেকে এক ঝলক উগ্র গন্ধ। গুলবাহার সেন্ট। এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি; বিশেষ করে লালমোহনবাবু।

টিপ্ টিপ্ বুকে ফেলুদার পিছন পিছন লিফটে ঢুকে গেলাম।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

গুলবাহার সেন্ট মিঃ সান্যাল ছাড়াও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে।

ফেলুদা কথাটার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতেরো নম্বর বোতাম টিপল। আমরা আরও পাঁচতলা ওপরে উঠে গেলাম।

অন্যান্য তলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের দরজায় লেখা এইচ হেক্রথ। ফেলুদা বলল, জামান নাম। ডান দিকের দরজায় লেখা এন সি মানসুখানি। নিঘাত সিন্ধি নাম। মাঝখানের দরজায় কোনও নাম নেই।

ফ্ল্যাট খালি, বললেন লালমোহনবাবু।

নাও হতে পারে, বলল ফেলুদা। সবাই দরজায় নাম লাগায় না। ইন ফ্যাক্ট, আমার বিশ্বাস এ ফ্ল্যাটে লোক রয়েছে।

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম। যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার হয় না, তাতে ধুলো জমে থাকা উচিত। অথচ এটা ভাল করে কাছ থেকে দেখুন, আর অন্য দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম, ফেলুদা ঠিক বলেছে। দিব্যি চকচক করছে বোতাম, ধুলোর লেশমাত্র নেই।

টিপবেন নাকি? কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা অবিশ্যি বোতাম টিপল না। তার বদলে যেটা করল, সেটা আরও অনেক বেশি তাজ্জব ব্যাপার। —মাটিতে উপুড় হয়ে সটান শুয়ে নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নীচে আধ ইঞ্চি ফাকটাতে। তারপর বার দুয়েক জোরে নিশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল, কড়া কফির গন্ধ।

তারপর যেটা করল, সেটাও অদ্ভুত। লিফট ব্যবহার না করে আঠারো তলা থেকে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। প্রত্যেক তলাতেই থেমে প্রায় আধ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে কী যে দেখল, তা ওই জানে।

সব সেরে নীচে যখন নামলাম, তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। বেশ বুঝতে পারছি যে, বম্বে এসে আমরা একটা প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

৭

আপনাকে একটু জেরা করলে আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।

কথাটা বলল ফেলুদা, লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে। মিনিট দশেক হল শিবাজী কাস্‌ল থেকে ফিরেছি—রিসেপশনে খবর পেয়েছি যে এই আধ ঘন্টা আগে—তার মানে যখন আমরা শিবাজী কাস্‌লর সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন—লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল; কে করেছিল তা জানা নেই।

আসলে পুলকই বারবার করছে, বললেন লালমোহনবাবু। 'পুলক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।'

এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুদার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন, পুলিশের জেরাতেই যখন ফ্লাইং কালারসে বেরিয়ে এলুম, তখন আর আপনার জেরায় কী আপত্তি থাকতে পারে?

আচ্ছা, মিঃ সান্যালের প্রথম নামটা তো আপনার জানা নেই।

না মশাই, ওটা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন তো। আপনার বইয়ে যে রকম আধাখেচড়া বর্ণনা থাকে, সে রকম নয়।

লালমোহনবাবু গলা খাঁকরিয়ে ভুরু কুঁচকোলেন।

হাইট...এই ধরুন গিয়ে—

আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন?

তা তেমন তেমন লম্বা বা বেঁটে হলে—

ইনি কি খুব লম্বা?

তা অবিশ্যি না।

খুব বেঁটে?

না, তাও অবিশ্যি না।

তা হলে হাইট পরে। আগে মুখ বলুন।

তাও বলুন।

চওড়া মুখ। চোখ, আপনার—ইয়ে, চোখে চশমা; দাড়ি আছে, চাপ দাড়ি, গোঁফ আছে—দাড়ির সঙ্গে জোড়া—

ফ্রেঞ্চকাট? :

এই সেরেছে। না, তা বোধহয় না। ঝুলপির সঙ্গেও জোড়া।

তারপর?

কাঁচাপাকা মেশানো চুল। ডান দিকে—না না, বা দিকে সিঁথি।

দাঁত?

পরিষ্কার। ফলস-টিথ বলে তো মনে হল না।

গলার স্বর?

মাঝারি। মানে, মোটাও না সরুও না।

হাইট?

মাঝারি।

ভদ্রলোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না? বম্বের? বলেছিলেন অসুবিধা হলে একে ফোন করবেন—বেশ হেলপফুল? :

দেখেছেন! বেমালুম ভুলে গেসলুম। আজ যখন পুলিশ জেরা করল, তখনও বলতে ভুলে গেলুম।

আমাকে বললেই চলবে।

দাঁড়ান, দেখি।

লালমোহনবাবু মানিব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ-করা নীল কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা সেটা খুব মন দিয়ে দেখল, কারণ লেখাটা মিঃ সান্যালের নিজের। তার পর কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল:

তোপসে, নম্বরটা চা তো—টু ফাইভ থ্রি ফোর ওয়ান এইট।

আমি অপারেটরকে নম্বর দিয়ে দিলাম। ফেলুদা ইংরাজিতেই কথা বলল।

হ্যালো, মিস্টার দেশাই আছেন? আচ্ছা ফ্যাসাদ।

এই নম্বরে মিঃ দেশাই বলে কেউ নাকি থাকেই না। যিনি থাকেন, তাঁর পদবি পারেখ, আর গত দশ বছর তিনি এই নম্বরেই আছেন।

লালমোহনবাবু, ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল, সানালকে আপনার নেকস্ট গল্প বিক্রি করার আশা ছাড়ন। লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং আমার বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে আনলেন, সেটিও অত্যন্ত গোলমেলে।

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সত্যি বলতে কী মশাই, লোকটিকে আমারও কেন জানি বিশেষ সুবিধের বলে মনে হয়নি।

ফেলুদা হুমকি দিয়ে উঠল।

আপনার ওই 'কেন জানি' কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেন সেটা জানতে হবে, বলতে হবে। চেষ্টা করে দেখুন তো পারেন কি না।

লালমোহনবাবুর অবিশ্যি ফেলুদার কাছে ধমক খাওয়ার অভ্যেস আছে। এটাও জানি যে উনি সেটা মাইন্ড করেন না, কারণ ধমক খেয়ে খেয়ে ওঁর লেখা যে অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে, সেটা উনি নিজেই স্বীকার করেন।

লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। এক নম্বর, লোকটা সোজাসুজি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। দুই নম্বর, সব কথা অত গলা নামিয়ে বলার

কী দরকার তাও জানি না। যেন কোনও গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন। তিন নম্বর...

দুঃখের বিষয়, তিন নম্বরটা যে কী, সেটা লালমোহনবাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না।

সাড়ে ছটায় লোটাসে ইভনিং শো, তাই আমরা ছটা নাগাদ উঠে পড়লাম। আমরা মানে আমি আর লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল যাবে না, কাজ আছে। ব্যাগের ভিতর থেকে ওর সবুজ নোটবইটা বেরিয়ে এসেছে, তাই কাজটা যে কী সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

ওয়রলিতে ফিরে যেতে হল আমাদের, কেননা সেখানেই লোটাস সিনেমা। লালমোহনবাবুর বেশ নাভাস অবস্থা; পুলকবাবু কেমন পরিচালক, সেটা তীরন্দাজ ছবি দেখেই মালুম হবে। বললেন, তিনটে ছবি যখন পর পর হিট করেছে, তখন একেবারে কি আর ওয়্যাক-থু হবে? কী বলো, তপেশ?

আমি আর কী বলব? আমি নিজেও তো ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি।

পুলকবাবু ম্যানেজারকে বলতে ভোলেননি; রয়েল সার্কলে তিনটে সিট আমাদের জন্য রাখা ছিল। এটা ছবির রিপিট শো, তাই হলে এমনিতেই অনেক সিট খালি ছিল।

ইন্টারভ্যালের আগেই বুঝতে পারলাম যে 'তীরন্দাজ' হচ্ছে একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট কোডোপাইরিন-মার্কা ছবি। এর মধ্যেই অন্ধকারে বেশ কয়েকবার আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি। হাসি পাচ্ছিল, আবার সেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কী অবস্থা হবে আর তার ফলে জটায়ুর কী অবস্থা হবে, সেটা ভেবে কষ্টও হচ্ছিল। ইন্টারভ্যালে বাতি জ্বললে পর লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, গড়পারের ছেলে—তুই অ্যাদিন এই করে চুল পাকালি? তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, ফি পুজোয় পাড়ায় একটা

করে থিয়েটার করত; যদ্দূর মনে পড়ছে বি কম ফেল —তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়, বলো তো?

ইন্টারভ্যালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভয় ছিল, পুলকবাবু বা তার দলের কেউ যদি বাইরে থাকে; কিন্তু সে রকম কাউকে দেখলাম না।

'যদি জিজ্ঞেস করে তো বলে দেব ফাস্ট ক্লাস। পকেটে করকরে নোটগুলো না থাকলে মনটা সত্যিই ভেঙে যেত তপেশ।

গাড়িটা হাউসের সামনেই উলটোদিকের ফুটপাতে পার্ক করা ছিল। লালমোহনবাবু সে দিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক ঠোঙা ডালমুট, দু প্যাকেট মাংঘারামের বিস্কুট, ছটা কমলালেবু আর এক প্যাকেট প্যারির লজঞ্চুস কিনে নিলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে বসে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায়, তখন এগুলো কাজে দেবে।

দুজনে দুহাত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, আর উঠেই বাই করে মাথাটা ঘুরে গেল।

গাড়ির ভিতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ।

আসার সময় ছিল না; এই দেড় ঘন্টার মধ্যে হয়েছে।

মাথা ঝিম ঝিম করছে, তপেশ, বললেন লালমোহনবাবু। 'এ ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই না। সান্যাল খুন হয়েছে, আর তার সেন্ট-মাখা ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপেছে।

আমার মনে হল—ঘাড়ে নয়, গাড়িতে চেপেছে; কিন্তু সেটা আর বললাম না।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, সে বেশির ভাগ সময় গাড়িতেই ছিল, কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য কাছেই একটা রেডিয়ো-টেলিভিশনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল খিলে হ্যয় গুলশন গুলশন দেখেছে। হ্যা, গন্ধ

সেও পাচ্ছে বইকী, কিন্তু গাড়ির ভিতরে কী করে এমন গন্ধ হয়, সেটা কিছুতেই তার মগজে ঢুকছে না। ব্যাপারটা তার কাছেও একেবারেই আজব।

হোটেলে ফিরে এসে কথাটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, রহস্য যখন জাল বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে, লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয় না, আর তা না হলে ফেলুমিত্তিরের মস্তিষ্কপুষ্টি হয় না।

কিন্তু—

আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করবেন, লালমোহনবাবু। না, কিনারা এখনও হয়নি। এখন শুধু জালের ক্যারেকটারটা বোঝার চেষ্টা করছি।

তুমি বেরিয়েছিলে বলে মনে হচ্ছে?—আমি ধাঁ করে একটা গোয়েন্দা-মার্কা প্রশ্ন করে বসলাম।

সাবাস তোপসে। তবে হোটেল থেকে বেরোইনি। এটা নীচে রিসেপশনেই দিল। ফেলুদার পাশে একটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টাইমটেবল ছিল, সেটা দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।

দেখছিলাম কাঠমাণ্ডু থেকে কটা ফ্লাইট কলকাতায় আসে, আর কখন আসে।

কাঠমাণ্ডু বলতেই একটা জিনিস ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল।

আচ্ছা, ইনস্পেক্টর পটবর্ধন যে নানাসাহেবের কথা বলেছিলেন, সেটা কোন নানাসাহেব?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন নানাসাহেবই বিখ্যাত।

যিনি সিপাহি বিদ্রোহে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন?

লড়েওছিলেন, আবার তাদের কাছে থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েও ছিলেন। হাজির হয়েছিলেন গিয়ে একেবারে কাঠমাণ্ডু। সঙ্গে ছিল মহামূল্য ধনরত্ন—ইনকুডিং হিরে আর মুক্তোয় গাঁথা একটি হার—যার নাম

নওলাখা। সেই হার শেষ পর্যন্ত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে। তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন নানাসাহেবের স্ত্রী কাশীবাঈকে।

এই হার কি নেপাল থেকে চুরি হয়ে গেছে নাকি?

পটবর্ধনের কথা শুনে তো তাই মনে হয়।

আমি কি ওই হারই পাচার করে বসলুম নাকি মশাই? লালমোহনবাবু তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ফেলুদা বলল, ভেবে দেখুন। ইতিহাসে হিরের অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম।

কিন্তু..কিন্তু... সে তো তা হলে যথাস্থানে পৌছে গেছে। সে জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না যায় সে তো দেখবে পুলিশ। আপনি কী নিয়ে এত ভাবছেন? আপনি নিজেই কি এই স্মাগলারদের—

ঠিক এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর লালমোহনবাবুর দিকেই ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন। হ্যালো—হ্যাঁ, মানে ইয়েস—স্পিকিং।

লালমোহনবাবুরই ফোন। বোধ হয় পুলকবাবু। না, পুলকবাবু না। পুলকবাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহনবাবুর মুখ অতটা হা হয়ে যাবে, আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পিছিয়ে আসবে।

ফেলুদা ভদ্রলোকের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধহয় কিছু না শুনতে পেয়েই সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল, সানাল কি?

মাথা নেড়ে হ্যা বলতেও যেন কষ্ট হল ভদ্রলোকের। বুঝলাম মাসূলগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না।

কী বলল? আবার ফেলুদা।

বলল— লালমোহনবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন। বলল—মু-মুখ খুললে পেপ-পেট ফাঁক করে দেবে।

যাক— ভাল কথা।

অ্যাঁ –বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন লালমোহনবাবু। আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেলুদার হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদা বলল, শুধু গুলবাহারের গন্ধে হচ্ছিল না। কু হিসেবে ওটা বড্ড পলকা। এমনকী লোকটা সত্যি করে বম্বে এসেছে না অন্য কেউ সেন্টটা ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না। এখন অন্তত শিওর হওয়া গেল।

কিন্তু আমার পেছনে লাগা কেন?

মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

সেটা জানলে তো বাজিমাত হয়ে যেত লালমোহনবাবু। সেটা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

৮

লালমোহনবাবু ডিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না, কারণ ওঁর নাকি একদম খিদে নেই। ফেলুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ দুপুরে কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভালই হয়েছে। সত্যি বলতে কী, আমাদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন।

খাওয়ার পর গতকাল তিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পান কিনেছিলাম। আজ লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না। বললেন, ওই ভিড়ের মধ্যে কে যাচ্ছে মশাই? সান্যালের লোক নিঘাত হোটেল ওয়াচ করচে, বেরোলেই চাক্কু।

শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই বরোল, লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলে, আর বার বার খালি বলতে লাগলেন, "কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম। ক্রমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে কী কুক্ষণেই হিন্দি ছবির জন্য গল্প লিখেছিলাম, আর সব শেষে কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম পর্যন্ত চলে গেলেন।

আপনার একা শুতে ভয় করবে না তো? ফেলুদা পান বিলি করে জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে ফেলুদা আশ্বাস দিয়ে বলল, আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধারে একটা ছোট্ট ঘর আছে দেখেছেন তো? ওখানে সব সময় বেয়ারা থাকে। হোটেলে সারা রাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। এ তো আর শিবাজী কাসল না।

শিবাজী কাসল নামটা শুনে লালমোহনবাবু আরেকবার শিউরে উঠলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাদ গুডনাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সারা দিন বম্বে চষে বেড়ানোর চেয়েও পুলকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহিল লাগছিল, তাই জটায়ু চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যেই

শুয়ে পড়লাম। ফেলুদা যে এখন শোবে না, সেটা জানি। ওর নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারা দিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, হয়তো আরও কিছু লেখা হবে।

আমি অনেক দিন চেষ্টা করেছি রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন ঘুমটা আসে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে বুঝেছি ঘুমটা কখন জানি আমার অজান্তেই এসে গেছে। আজও কখন ঘুমিয়েছি সেটা টের পাইনি। ঘুমটা ভাঙল দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা, আর সেই সঙ্গে বোতাম টেপার চা শব্দে। উঠে দেখি, ফেলুদার ল্যাম্প তখনও জ্বলছে আর বালিশের পাশে রাখা আমার ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ফেলুদা দরজা খুলতেই হুমড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন সেটা কিন্তু মনে হল না, আর যে-কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই, সেটাও ভয়ের কথা নয়।

কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার মশাই!

আগে খাটে এসে বসুন, বলল ফেলুদা।

দুর মশাই, বসব কী—এই দেখুন—কাঠমাণ্ডুর কী মহামূল্য ধনরত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।

লালমোহনবাবু ফেলুদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন, সেটা একটা বই। ইংরিজি বই, আর নাম-করা বই; ল্যান্সডাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল, সে দিনও দেখেছি। বইটা হল শ্রীঅরবিন্দের লেখা দ্য লাইফ ডিভাইন।

ফেলুদারও চোখ কপালে উঠে গেছে।

তার উপর আবার বাঁধাইয়ের গণ্ডগোল, বললেন লালমোহনবাবু। প্রথম ত্রিশ পাতার পর কয়েকটা পাতা পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। এ বই না দেখে কিনলে তো পুরো টাকাটা ডেড লস মশাই। পণ্ডিচেরীর বাইন্ডার এ রকম কাঁচা কাজ করবে ভাবতে পারেন?

তা হলে সে দিন কী দিলেন লালশার্টের হাতে? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

জানেন কী দিলুম, ভাবতে পারেন? আমার নিজের বই মশাই, নিজের বই! বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। পুলককে তো পাণ্ডুলিপির কপি পাঠিয়েছিলুম, তাই এবার ভাবলুম এক কপি ছাপা বই দেব—উইথ মাই ব্লেসিংস অ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ। আরও তিন কপি রয়েছে এখনও আমার ব্যাগে, প্রত্যেকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া। আমার ভক্ত তো সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে—তাই ভাবলুম, বম্বে যাচ্ছি, যদি এক-আধজনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়ে যায়, তাই সঙ্গে এনেছিলুম, আর তারই একটা কপি—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

এত হালকা লালমোহনবাবুকে অনেক দিন দেখিনি।

বইটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ফেলুদা বলল, কিন্তু সানাল যে টেলিফোনে হুমকি দিল, সেটা কী ব্যাপার? এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন খাপ খাচ্ছে কি?

লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না। কে বলল সান্যাল? টেলিফোনে অত গলা চেনা যায় নাকি? কোনও উটকো বদমাশ রসিকতা করছে হয়তো। বোম্বাইতে যদি তীরন্দাজ ছবি হিট হতে পারে তো সবই হতে পারে।

আর গাড়িতে গুলবাহার সেন্ট?

ওটা ওই ড্রাইভারই মাখে। কী রকম টেরির বাহার দেখেছেন? শৌখিন লোক। ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না।

তা হলে আর কী, নিশ্চিন্তে ঘুমোন গিয়ে। সে আর বলতে। মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলুম কোডোপাইরিনের জন্য, আর তাতেই এই হাই-ভোলটেজ আবিষ্কার। যাক, রহস্য যখন মিটেই গেল, তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাত্মিক বিষয় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করুন। বইটা রেখে গেলুম। গুড নাইট।

লালমোহনবাবু চলে গেলেন, আর আমিও আবার নিজের জায়গায় এসে শুলাম।

যে লোক অরবিন্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল, তার মনের অবস্থা কী হবে ফেলুদা?

'খেপচুরিয়াস', বালিশে মাথা দিয়ে বলল ফেলুদা। মাথার পিছনের বাতিটা ও জ্বলিয়েই রাখল। দেখে হাসি পেল, ফেলুদা তার সবুজ নোটবই সরিয়ে রেখে অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের পাতা ওলটাল।

আমার বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘুমে বন্ধ হল।

৯

বম্বে থেকে পুণা যাবার পথে খাণ্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আমাদের যেতে হবে শুটিং দেখতে। ছবির এগারোটা ক্লাইম্যাক্সের শেষ ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তোলা হবে আজ। এক দিনে কাজ শেষ হবে না, পর পর আরও চার দিন যেতে হবে সবাইকে। আমরা ঠিক করেছি আজ যদি ভাল লাগে, তা হলে বাকি ক' দিনও যাব। ট্রেনটা এই পাঁচ দিনই পাওয়া যাবে, প্রতি দিনই ঠিক একটা থেকে দুটো—অর্থাৎ এক ঘণ্টার জন্য। ডাকাত দলের ঘোড়া আর হিরোর লিংকন কনভারটিবল থাকবে সারা দিনের জন্য। ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারের জায়গা দখল করে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিরোইন আর তার কাকা। মোটরে করে হিরো ট্রেনের উদ্দেশে ধাওয়া করছে। এদিকে হিরোর যে যমজ ভাই—যাকে ছেলেবেলায় ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর যে, এখন নিজেই ডাকাত—সে আসছে ঘোড়া করে দলবল নিয়ে ট্রেনটাকে অ্যাটাক করবে বলে। মোটরে হিরো এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ড়াকাত ভাই ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে পড়ে। ইঞ্জিনের ভিতর ফাইট হয়, ভিলেন-ড্রাইভার খতম

হয়। সেই সময় মোটরে করে হিরো এসে পড়ে, আর তারপর.বাকি অংশ রুপালি পদায় দেখিবেন। আসলে শেষটা নাকি তিন রকম ভাবে তোলা হবে, তারপর পর্দায় যেটা বেশি ভাল লাগে সেটা রাখা হবে।

পুলকবাবু সকালে তিন মিনিটের জন্য ঢুঁ মেরে গেছেন। আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক জেনে বললেন, লালুদা, আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি তীরন্দাজ আপনার খুব ভাল লেগেছে।

আসলে লালমোহনবাবু সকাল থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে আপন মনে হেসে ফেলছিলেন; পুলকবাবুর সামনে সেই হাসিটাই বেরিয়ে পড়েছিল। এখন পুলকবাবুর কথা শুনে আরও জোরে হেসে বললেন, ওঃ—গড়পারের ছেলে—তুমি দ্যাখালে ভাই—হ্যাঃ।

ফিরতে রাত হবে, তাই ফেলুদা বলল হাত—ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে নিতে। কালকের কেনা কমলালেবু, বিস্কুট, লজঞ্চুস ইত্যাদি তিন ব্যাগে ভাগ করে দেওয়া হল, আর লালমোহনবাবুর ক্যাশ দশ হাজার টাকা ম্যানেজারের জিন্মায় সিন্দুকে রেখে রসিদ নিয়ে নেওয়া হল। কী জানি বাবা, ভদ্রলোক বললেন, ফিলিমের ডাকাতের দলে আসল ডাকাতও যে ঢুকে পড়বে না এক-আধটা, তার কী গ্যারান্টি?

ফেলুদা সকালে একবার বেরিয়েছিল, বলল ওর সিগারেটের স্টক নাকি ফুরিয়েছে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে। ও ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আজও দেখলাম গাড়িতে গুলবাহারের গন্ধ কিছুটা রয়ে গেছে।

বম্বে থেকে থানা স্টেশন প্রায় পচিশ কিলোমিটার। সেখান থেকে রাস্তা ডাইনে ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পুণার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় আশি কিলোমিটার গেলেই খাণ্ডালা। আজ দিনটা ভাল, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ হাওয়ার তেজে তরতর করে ভেসে চলেছে, তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ

বেরিয়ে বোম্বাই শহরটাকে বার বার ধুয়ে দিচ্ছে। পুলকবাবু বলে গেছেন শুটিং-এর জন্য এটা নাকি আইডিয়াল ওয়েদার। লালমোহনবাবুর অবিশ্যি আজকে সব কিছুই ভাল লাগছে। খালি খালি বললেন, বিলেত যাবার আশ মিটে গেল মশাই। বাসে লোক ঝুলছে না সেটা লক্ষ করেছেন? ওঃ—কী সিভিক সেন্স এদের!

থানা পৌছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এখন সোয়া নটা। হাতে সময় আছে, তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার স্বরূপলাল একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেয়ে নিলাম।

থানা ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটস-এর পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। ট্রেন লাইন আর এখন আমাদের পাশে নেই; সেটা থানার পরেই উত্তরে ঘুরে চলে গেছে কল্যাণ। কল্যাণ থেকে আবার দক্ষিণে ঘুরে সেটা মাথেরান হয়ে যাবে পুণা, মাঝপথে পড়বে আমাদের লেভেল ক্রসিং।

পথে লালমোহনবাবুর গলায় কমলালেবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম লাগা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। ফেলুদার মনের অবস্থা কী সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। ও গভীর মানেই যে চিন্তিত, সেটা ফেলুদার বেলায় খাটে না এ আমি আগেও দেখেছি।

সাড়ে বারোটা নাগাত খাণ্ডালা ছাড়িয়ে মাইলখানেক যেতেই সামনে দূরে রাস্তার ধারে একটা জায়গায় মনে হল যেন মেলা বসেছে। তারপর মনে হল মেলায় এত গাড়ি থাকবে কেন? আরও কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া আর একটা জিনিস চোখে পড়ল, সে হচ্ছে ঘোড়া। এবারে বুঝলাম ভিড়টা আসলে হচ্ছে জেট বাহাদুরের শুটিং-এর দল। সব মিলিয়ে অন্তত শ'খানেক লোক, বাক্সপ্যাটরা ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর শতরঞ্চি—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডর আর একটা বাসের মাঝখানে একটা ফাঁক পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে থেমে গেল। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবু

এগিয়ে এলেন—তাঁর মাথায় একটা সাদা কাপ আর গলায় ঝুলোনো একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র।

গুড মর্নিং। সব ঠিক হ্যায়?

আমরা তিনজনেই মাথা নেড়ে 'ইয়েস' জানিয়ে দিলাম।

শুনুন—মিস্টার গোরের ইনস্ট্রাকশন—উনি মাথেরানে আছেন যেখান থেকে ট্রেন আসছে। রেল কোম্পানির কতাদের সঙ্গে কথাবাত আছে; কিছু পেমেন্টও আছে বোধহয়। উনি ট্রেনের সঙ্গেই চলে আসবেন, অথবা মোটরে করে আসবেন। আপনারা ট্রেনটা এলেই খবর পেয়ে যাবেন। মোট কথা, উনি আসুন বা না আসুন, আপনারা ফাস্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। অল ক্লিয়ার?

অল ক্লিয়ার, বলল ফেলুদা।

বোম্বাইয়ের ফিল্ম লাইনে যে এত বাঙালি কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল না। তার মধ্যে কেউ কেউ যে ফেলুদাকে চিনে ফেলবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? ক্যামেরাম্যান দাশু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ কুঁচকে গেল।

মিত্তির? আপনি কি ডিটেক—?

ধরেছেন ঠিক, কিন্তু চেপে রাখুন, বলল ফেলুদা।

কেন মশাই? আপনি তো আমাদের প্রাইড। সেবারে এলোরার মূর্তি চুরির ব্যাপারটা—

ফেলুদা আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামাল।

দাশুবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, আবার কোনও তদন্ত-টদন্ত করছেন নাকি এখানে?

আজ্ঞে না, ফেলুদা বলল, স্রেফ বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে।

দাশু ঘোষ একুশ বছর বম্বেতে থেকেও নিয়মিত বাংলা উপন্যাস পড়েন, এমনকী জটায়ুর বইও পড়েছেন দু-তিনটে। এ দৃশ্যে অবিশ্যি উনি ছাড়া আরও

দুজন ক্যামেরাম্যান কাজ করছেন; তাঁরা অবাঙালি। পুলকবাবুর চারজন অ্যাসিসট্যান্টের দুজন বাঙালি। যাঁরা অ্যাকটিং করবেন তাঁদের মধ্যে অবিশ্যি কেউই বাঙালি নেই। অর্জুন মেরহোত্রা ছাড়া আজ আছেন ভিলেনবেশী মিকি। শুধু মিকি; পদবি ব্যবহার করেন না। বোম্বাইয়ের উঠতি ভিলেনের মধ্যে টপ, একসঙ্গে সাঁইত্রিশটা ছবি সই করেছেন, যদিও তার মধ্যে উনত্রিশটার গল্পো চেঞ্জ করে ফাইটের সংখ্যা কমাতে হচ্ছে। ভাগ্যে জেট বাহাদুর-এ মাত্র চারটে ফাইট, না হলে পুলকবাবু, আর মিস্টার গোরেকেও মাথা চুলকোতে হত।

এ সব খবর আমাদের দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার সুদর্শন দাস। ইনি উড়িষ্যার লোক, অনেক দিন বম্বেতে রয়েছেন, তবে এ ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে নিজে ওড়িয়া ছবি পরিচালনা করবেন।

ফেলুদা ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে আর একটা জটলার দিকে। সেখানে ডাকাতের দলকে মেক-আপ করে পোশাক পরানো হচ্ছে। একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেলুদাকে দিব্যি বাৎচিৎ করতে দেখে একটু অবাক হয়েই এগিয়ে গেলাম। তারপর ডাকাতের গলা শুনে বুঝলাম—ওমা, এ যে কুং-ফু এক্সপার্ট ভিক্টর পেরুমল। হিরোর যমজ ভাইয়ের মেক-আপ করা হয়েছে তাকে। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাতে পড়তে হবে, তারপর ছটা কামরার ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে ইঞ্জিনে পৌছে ভিলেনবেশী মিকিকে ঘায়েল করতে হবে। তারপর হিরো আর তার বিশ-বছর-না-দেখা ডাকাত-বনে-যাওয়া ভাইয়ের মধ্যে হাই-ভোল্টেজ সংঘর্ষ।

লালমোহনবাবু এই এলাহি ব্যাপার দেখে কেমন জানি চুপ মেরে গেছেন, যদিও ভেবে দেখলে তাঁর ফুর্তি হবার কথা, কারণ তাঁর গল্পকে ঘিরেই এত হই-হল্লা। বললেন, একটা গল্প লিখে এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গম এত পরিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলিচি, এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে, তপেশ। এক এক সময় নিজেকে রীতিমতো শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার গিলটি মনে হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এরা লেখককে কোনও সম্মান দেয় না। ক'টা লোক এখানে জটায়ুর নাম জানে, সেটা বলতে পারো?

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, ছবি যদি হিট হয়, তা হলে নিশ্চয়ই জানবে। আশা করি —দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু। যে সব ডাকাতের মেক-আপ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বটগাছের তলায় জড়ো হয়েছিল। গুনে দেখলাম সবসুদ্ধ নাটা।

মিনিটখানেকের মধ্যেই নীল কাচ-তোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিংকন কনভারটিবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হল। হিরোইনের দরকার

লাগবে না, কারণ ট্রেনের কামরায় বন্দি অবস্থায় তার শটগুলো নাকি স্টুডিয়োতে তোলা হবে। সেটা এক হিসেবে ভাল। এই দুই পুরুষ তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে যা শোরগোল পড়ে গেল, হিরোইন থাকলে না জানি কী হত।

সুদর্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন, আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়ালা ফেরত দিচ্ছি, এমন সময় বাজখাই গলায় লাউডস্পিকারের হাঁক শোনা গেল—ট্রেন কামিং! ট্রেন আতি হ্যায়! এভরিবডি রেডি!

১০

ঝুক ঝুক সঙ্গে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আটটা বোগি সমেত পুরনো টাইপের ইঞ্জিনটা যখন লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ফাস্ট ক্লাস কামরা যে মাত্র একটাই, আর সেটাও যে পুরনো ধাঁচের, সেটা দূর থেকেই বুঝতে পারছি। অন্য কামরাগুলোতে মাথেরান থেকেই প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সব রকমই আছে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবুর ব্যস্ততা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি একবার এ ক্যামেরা থেকে ও ক্যামেরায় ছুটে যাচ্ছেন, একবার হিরো থেকে ভিলেন, একবার এ-অ্যাসিসট্যান্ট থেকে ও-অ্যাসিসট্যান্ট। লালমোহনবাবু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, না মশাই, শুধু টাকা দিয়ে ছবি হয় না এটা বোঝা যাচ্ছে।

হিরোর গাড়ি রেডি, কালো চশমা পরে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে অর্জুন মেরহোত্রা, পাশে তার নিজের মেক-আপম্যান আর দুজন ছোকরা টাইপের লোক, বোধহয় চামচাটামচা হবে।

অর্জুনের সামনে একটা হুডখোলা জিপে তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর ক্যামেরাও রেডি। ভিক্টর সমেত ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে আগেই এগিয়ে গেছে। তারা চলন্ত ট্রেন থেকে সিগন্যাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেষ জায়গা থেকে নেমে এসে ট্রেনের পাশে পাশে দৌড় আরম্ভ করবে। ভিলেন মিকিকে দেখলাম পুলকবাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের কী করা উচিত, ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ মিঃ গোরের দেখা নেই। তিনি ট্রেনেই এসেছেন কি না সেটাও বুঝতে পারছি না।

ভিড় পাতলা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসখুসুনি আরম্ভ হয়ে গেল। বললেন, ও ফেলুবাবু, এরা কি ভুলে গেল নাকি আমাদের?

ফেলুদা বলল, একটিই মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা; কথা মতো সেটাতে গিয়েই ওঠা উচিত আমাদের। দেখি আরও দু মিনিট।

দু মিনিটের আগেই, ইঞ্জিন থেকে দুটো হুইসল শোনা গেল, আর সেই মুহূর্তেই সুদর্শন দাসের হাঁক।

এই যে, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন!

আমরা হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম। সুদর্শনবাবু আমাদের ফাস্ট ক্লাসের দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। বললেন, আমি তো কিছুই জানতাম না। এইমাত্র একজন লোক এসে খবর দিলে—বললে গোরে সাহেব আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রথম শটের পর ট্রেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে।

কামরায় উঠে দেখি একটা বেঞ্চির উপর বড় জলের ফ্লাস্ক, আর সাফারি রেস্টোর্যান্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাক্স। অথাৎ আমাদের লাঞ্চ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ভদ্রলোকের যে আশ্চর্য খেয়াল, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আর একটা হুইসেলের সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তিনজনে

তাই মনে একটা বেশ রোমাঞ্চ ভাব হচ্ছিল।

গাড়ি ক্রমশ স্পিড নিচ্ছে। ডান পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, সেদিকের বেঞ্চিতেই বসেছি আমরা তিনজন। বাঁ দিকে পাহাড় পড়বে, অর্থাৎ সেটা হল ডাকাতের দিক। ডান দিকটা হিরোর দিক।

আরও একটু স্পিড বাড়ার পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সমেত জিপ, তার পর হিরোর গাড়ি আসতে দেখা গেল। এখন অবিশ্যি হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ক্যামেরার মুখটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেটা বুঝতে পারলাম। যিনি ছবি তুলছেন, তিনি ছাড়া আরও তিনজন লোক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন হল পুলকবাবুর অ্যাসিসট্যান্ট। সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভিতর দিয়ে হিরোকে 'ডাইনে তাকাও' 'বাঁয়ে তাকাও' ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছে।

আর দুটো ক্যামেরার একটার সঙ্গে পুলকবাবু রয়েছেন—সেটা রয়েছে ট্রেনেরই একটা কামরার ভিতর। তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে ট্রেনের পিছন দিকের শেষ কামরার ছাতে।

হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে আমার মনটা দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই মনে হবে, কারণ ক্যামেরার স্পিড কমিয়ে শটটা নেওয়া হচ্ছে।

তা ছাড়া যতটা আস্তে ভাবছিস, ততটা আস্তে কিন্তু যাচ্ছে না গাড়িটা, কারণ আমাদের ট্রেনটাও তো চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, আর চলেছে বেশ জোরেই।

ঠিক কথা। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরা আর হিরোর গাড়ি আমাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেল। পুরনো কামরা, তাই জানালায় গরাদ নেই; গলা বাড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, জেট বাহাদুর ছবি

দেখতে গিয়ে যদি পদায় দেখিস, তুই গলা বাড়িয়ে শুটিং দেখছিস, সেটা কি খুব ভাল হবে?

লোভ সংবরণ করে উলটো দিকের জানালার ধারে বসব বলে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় নাকে গন্ধটা এল।

ফেলুদা দেখি আর আমার পাশে নেই। তার দৃষ্টি বাথরুমের দরজার দিকে, সে এক লাফে উলটোদিকে চলে গেছে, তার ডান হাত কোটের পকেটে।

বন্দুক বার করে লাভ নেই, মিস্টার মিত্তির। অলরেডি একটি রিভলভার আপনার দিকে পয়েন্ট করা রয়েছে।

এবার দেখলাম পাহাড়ের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একজন লোক হাতে একটা রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল। একে কি দেখেছি আগে? হ্যাঁ—এই তো সেই লালশার্ট! কিন্তু আজ এর পোশাক অন্য, আর চেহারায় যে হিংস্র ভাব দেখছি, সেটা সে দিন এয়ারপোর্টে দেখিনি। আজ এই অবস্থায় দেখে বুঝছি, লোকটা একেবারে নিখাদ খুনে। তার হাতের রিভলভারটা তাগ করা রয়েছে সোজা ফেলুদার দিকে।

এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কামরাটা গুলবাহারের গন্ধে ভরে গেল।

সান...সান...

লালমোহনবাবুর শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

সান্যালই বটে, বললেন আগন্তুক, আর আপনার সঙ্গেই আমার আসল দরকার মিঃ গাঙ্গুলী। বইয়ের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেলে রেখে আসেননি। ব্যাগটা খুলুন, খুলে বার করে দিন। না-দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই বললাম।'

প্যা-প্-প্যাকেট...

কী প্যাকেটের কথা বলছি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আপনারই বই আপনার হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে আসিনি সে দিন এয়ারপোর্টে। বার করুন, বার করুন!

আপনি ভুল করছেন। প্যাকেট ওঁর কাছে নেই, আমার কাছে।

ট্রেনের শব্দের জন্য সকলকেই চেচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে কিন্তু ফেলুদার গভীর গলা চাপা অবস্থাতেই ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সান্যালের কানে পৌছেছে, কারণ চশমার পিছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

লাইফ ডিভাইনের এতগুলো পাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাড়ল কি?—ফেলুদার গলার স্বর এখনও ধীর, কথাগুলো মাপা।

'নিম্মো', গুণ্ডাটার দিকে আড় দৃষ্টি দিয়ে খসখসে গলায় বললেন সানাল, ইয়ে আদমি কোই ভি গড়বড় করনেসে ইনকে খতম কর না..হাত তুলে রাখুন, মিস্টার মিত্তির?

'আপনার ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?' ফেলুদা বলল। আপনি যে জিনিসটা চাইছেন, সেটা পেলেই তো আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না। খতম আমাদের এমনিতেই করবেন। কিন্তু ট্রেন থামলে পর আপনার কী দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছেন?

'ভেরি ইজি', দাঁত বের করে বিশ্রী হেসে বললেন মিঃ সান্যাল, আমাকে আর কে চেনে বলুন! এত প্যাসেঞ্জার রয়েছে ট্রেনে, তার মধ্যে মিশে যেতে পারব না? আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে, আমি বাইরে বেরিয়ে অন্য কামরায় চলে যাব। ভেরি ইজি, ইজনট ইট?

ফেলুদার সঙ্গে অনেক রকম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা কারণে এই মুহুর্তে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বার বার আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কারণ আর কিছুই না—ওই নিম্মো। এ রকম একটা নিষ্ঠুর খুনে চেহারা গল্পেই পড়া যায়। কামরার বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের ফিনফিনে ফুলকারি করা শার্টটা খোলা জানালা দিয়ে আসা হাওয়াতে ফুরফুর করছে, ডান হাতটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুললেও রিভলভারটা ঠিকই ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

সান্যাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। নাক জ্বলে যাচ্ছে সেন্টের গন্ধে। সান্যালের দৃষ্টি ফেলুদার ব্যাগের দিকে। এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ, ফেলুদার সামনেই সিটের উপর রাখা। লালমোহনবাবুর কী অবস্থা জানি না, কারণ তিনি এখন আমার পিছনে। ট্রেনের আওয়াজের মধ্যেও ওঁর হাঁপানির টানের মতো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তার মানে শুটিংও হয়ে চলেছে নিশ্চয়ই। মিঃ গোরে কী সাংঘাতিকভাবে আমাদের ডোবালেন, সেটা উনি জানেন কি?

সান্যাল সিটে বসে বাক্সটার ক্যাচ টিপলেন। ঢাকনা খুলল না। বাক্সে চাবি লাগানো।

চাবি কোথায়? এটার চাবি কোথায়?

মিঃ সান্যালের সমস্ত মুখ অসহিষ্ণু রাগে কুঁচকে গেল। —কোথায় চাবি!

পকেটে, শান্তভাবে জবাব দিল ফেলুদা।

কোন পকেটে?

ডান।

আমি জানি ওই পকেটেই ফেলুদার রিভলভার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। রাগে ফুলছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর—

তুমি এসো! —আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

ফেলুদাও আমার দিকে চাইল। ইঙ্গিতে বুঝলাম, সে আমাকে সান্যালের আদেশ পালন করতে বলছে।

যখন ফেলুদার দিকে এগোচ্ছি, তখন ট্রেনের শব্দ ছাড়া আর একটা শব্দ কানে এল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এর মধ্যে কখন যে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে, তা খেয়ালই করিনি। ফেলুদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম পাহাড়ের গা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকাতের দল নামছে।

রিভলভারের পাশে হাতড়াতেই চাবি ঠেকল হাতে।

দিয়ে দে।

আমি চাবি দিয়ে দিলাম মিঃ সান্যালকে। ফেলুদার হাত দুটো এখনও মাথার উপর। সানাল বাক্সের তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন। বাক্স খুলে গেল। লাইফ ডিভাইন উপরেই রাখা। বাক্স থেকে বই বেরিয়ে এল।

জানালার ঠিক বাইরেই ঘোড়ার খুর। একটা নয়—অনেকগুলো—তীরবেগে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছুটে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সান্যাল বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটিয়ে যেখানে পৌছলেন, তার পরে আর উলটোনো যায় না। কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাঁটা। এবার উলটোনোর বদলে সানাল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। পাতার মাঝখানটা খামচিয়ে সেটাকে ছিড়ে ফেললেন, আর ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো খোপ বেরিয়ে পড়ল। পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেলে খোপটা তৈরি করা হয়েছে।

খোপের ভিতর দৃষ্টি দিতেই সান্যালের মুখের অবস্থা দেখবার মতো হল। উনি ভিতরে কী আশা করেছিলেন জানি না, এখন বেরোল খান আষ্টেক সিগারেটের পোড়া টুকরো, ডজন খানেক পোড়া দেশলাই আর বেশ খানিকটা সিগারেটের ছাই।

কিছু মনে করবেন না, বলল ফেলুদা, ওটাকে ছাইদান হিসাবে ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এবারে সান্যাল এত জোরে চ্যাঁচালেন যে, মনে হল সমস্ত ট্রেন ওর কথা শুনে ফেলবে।

বেয়াদবির আর জায়গা পাওনি? ভেতরের আসল জিনিস কোথায়?

কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি?

স্কাউন্ডেল!—তুমি জানো না কীসের কথা বলছি?

নিশ্চয়ই জানি, তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই?

কোথায় সে জিনিস?—আবার গজিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

পকেটে।

কোন পকেটে?

বাঁ পকেটে।

ডাকাতের দল এখন জানালার ঠিক বাইরে, কারণ পাহাড় আরও কাছে চলে এসেছে। ধুলো এসে ঢুকছে আমাদের কামরায়।

ইউ দেয়ার?

আমি জানি আমার উপর আবার হুকুম হবে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কী—যাও, হাত ঢোকাও।

আবার আদেশ মানতে হল।

এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল, তেমন জিনিস আমি কোনওদিন হাতে ধরিনি। হিরে আর মুক্তো দিয়ে গাঁথা এই আশ্চর্য হার রাজা-বাদশাদের হাতেই মানায়।

দাও ওটা আমাকে।

মিঃ সান্যালের চোখ জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু এবার রাগে নয়, উল্লাসে, লোভে।

আমার হাত সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। ফেলুদার হাত মাথার উপর তোলা। লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরোচ্ছে। ডাকাতের দল—

দড়াম!

একটা ভারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল, আর তার পরেই দেখলাম নিম্মো কামরার মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কারণ একজোড়া পা জানালা দিয়ে ঢুকে সটান সজোরে লাথি মেরেছে তার গায়ে। ফলে নিম্মোর হাতের রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিং-এর বাতির কাচ চুরমার করে দিল, আর সেই সঙ্গে ফেলুদারও হাতে বিদ্যুদ্বেগে চলে এল তার নিজের রিভলভার।

এবারে পাহাড়ের দিকের দরজাটা আবার খুলে গেল, আর সেই দরজা দিয়ে ডাকাতের বেশে যিনি ঢুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভাল করে চিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ, ভিক্টর, বলল ফেলুদা।

১১

মিঃ সান্যাল সিটের উপর বসে পড়েছেন। এবার কাঁপুনিটা রাগের নয়, ভয়ের, কারণ তিনি জানেন তিনি জব্দ, তাঁর আর পালাবার পথ নেই।

এদিকে শুটিং-এ গণ্ডগোল বুঝে কেউ নিশ্চয়ই চেন টেনে দিয়েছে, কারণ ট্রেনটা যেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয়।

থামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শোরগোল শুনতে পেলাম। একই লোকের নাম ধরে অনেকে চিৎকার করছে।

ভিক্টর। ভিক্টর! কোথায় গেল, ভিক্টর?

পুলকবাবুর গলা। যত গণ্ডগোল তো ভিক্টরকে নিয়েই, কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাতে, আর সে কিনা সোজা এসে ঢুকেছে আমাদের কামরায়।

ফেলুদা দরজা খুলে মুখ বার করে পুলকবাবুকে ডাকলেন।

এই যে মশাই, এদিকে।

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। দেখে মনে হল তাঁর শেষ অবস্থা, কারণ শুনেছি এই ধরনের একটা শটে গণ্ডগোল হওয়া মানে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া।

ব্যাপার কী, ভিক্টর? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আপনার ছবিতে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিক্টর পেরুমলই পেতে পারে, পুলকবাবু।

তার মানে? পুলকবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে। তার ফ্যালফ্যালে ভাবটার মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি মেশানো রয়েছে।

আর স্মাগলারের পার্টটা পরমেশ কাপুরকে না দিয়ে আপনার একে দেওয়া উচিত ছিল।

‘কী সব উলটোপালটা বকছেন। ইনি কে?’ পুলকবাবু মিঃ সান্যালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ইতিমধ্যে ডানদিকের রাস্তায় দুটো নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়েছে—একটা পুলিশ জিপ আর একটা পুলিশ ভ্যান। জিপটা আমাদের কামরার পাশেই এসে থামল। তার থেকে নামলেন ইনস্পেক্টর পটবর্ধন।

এইবার পুলকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই টানে তাঁর দাড়ি আর গোঁফ, আর আরও দুই টানে তাঁর পরচুলা আর চশমাটা খুলে ফেলে দিয়ে বলল—

আপনার গা থেকে গুলবাহারের গন্ধটাও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুশি হতাম মিস্টার গোরে, কিন্তু ওই একটি ব্যাপারে ফেলুমিত্তিরও অপারগ।

প্রোডিউসার মিসায় ধরা পড়লে ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা আপনাকে কে বললে, লালুদা?

প্রশ্নটা করলেন পুলকবাবু। লালমোহনবাবু কিছুই বলেননি, কেবল ঘাড় গোঁজ করে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন; যদিও এটা ঠিক যে গম্ভীর হবার একটা কারণ হল জেট বাহাদুরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা।

জেট বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না, লালুদা, বললেন পুলকবাবু। গোরে চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক, হাজতে যাক, যেখানে খুশি যাক—প্রোডিউসার তো আর বম্বেতে একটা নয়। চুনি পাঞ্চোলি তো এক বছর থেকে আমার পেছনে লেগে আছে—দেখবেন আপনারা থাকতে থাকতেই নতুন ব্যানারে আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আজকের শুটিং অবিশ্যি সেই দেড়টায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোরে আর নিম্মোর হাতে হাতকড়া পড়েছে, নানাসাহেবের নওলাখা হার পুলিশের জিম্মায় চলে গেছে। আজ যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝেছিল, আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাবার নাম করে ইন্সপেক্টর

পটবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ব্যবস্থা করে এসেছিল। গোরে নাকি এককালে একটানা বারো বছর কলকাতায় ছিল, শুধু ডন বস্কো নয়, সেন্ট জেভিয়ার্সেও পড়েছে—তাই বাংলাটা সে ভালই জানে—যদিও বম্বেতে সে সচরাচর হিন্দি, মারাঠি আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে।

আমরা বসে আছি খাণ্ডালা ডাকবাংলোর বারান্দায়। চমৎকার পাহাড়ে জায়গা, বাতাসে রীতিমতো ঠাণ্ডার আমেজ। বম্বের অনেকেই নাকি খাণ্ডালায় চেঞ্জে আসে। সাফারির মাটন দো পেয়াজি আর নান খাওয়া হয়ে গেছে আগেই, এখন বিকেল সাড়ে চারটে, তাই চা আর পকোঁড়া খাচ্ছে সকলে।

আমাদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি। পুলকবাবু ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, এইমাত্র উঠে মেরহোত্রার টেবিলে চলে গেলেন। অর্জুন মেরহোত্রার একটু যেন মনমরা ভাব; তার একটা কারণ হয়তো এই যে, আজকের হিরো হচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মিত্তির। ইতিমধ্যে অনেকেই ফেলুদার সই নিয়ে গেছে, এমনকী ভিলেন মিকি পর্যন্ত।

সেকেন্ড হিরো যে ভিক্টর পেরুমল তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। ফেলুদা ভিক্টরকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল—ঘোড়া নিয়ে যখন ট্রেনের ধারে পৌঁছাবে, তখন ফাস্ট ক্লাস কামরার দিকে একটু চোখ রেখো। গোলমাল দেখলে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে এসো, ফেলুদার দুহাত মাথার উপর তোলা দেখেই ভিক্টর ধরে ফেলেছে গণ্ডগোলের ব্যাপার। আশ্চর্য, এত বড় একটা কাজ করেও তার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। সে এরই মধ্যে আবার বাংলোর সামনের মাঠে তার লোকজন নিয়ে ওয়ান-টু-থ্রি করে কুং-ফু অভ্যাস শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কী—

লালমোহনবাবু এই এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। ফেলুদা ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনি এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে—তাই তো?

জটায়ু একটা গোবেচারা হাসি হেসে মাথা নেড়ে হ্যা বোঝালেন। ফেলুদা বলল, আপনার মনের অন্ধকার দূর করা খুব কঠিন নয়। তবে তার আগে গোরে লোকটাকে একটু বুঝতে হবে, তা হলেই তার কার্যকলাপটা বোধগম্য হবে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সে আসলে স্মাগলার, কিন্তু ভেক ধরেছে সম্ভ্রান্ত ফিল্ম প্রোডিউসারের। আপনার গল্প থেকে সে ছবি করছে। গল্পে আপনি শিবাজী কাস্‌লে স্মাগলাররা থাকে বলে লিখেছেন। স্বভাবতই গোরে তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—আপনি শিবাজী কাস্‌ল সম্বন্ধে কন্দূর কী জানেন, কারণ সে নিজে স্মাগলার আর তার বাসস্থানও শিবাজী কাসল। এইটে জানার জন্য সে সান্যাল সেজে আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সে বোঝে যে ভয়ের কোনও কারণ নেই, আপনি অত্যন্ত নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষ এবং শিবাজী কাসল-এর ব্যাপারটা আপনার কাছে একেবারেই কাল্পনিক। সেই সময় তার মাথায় আসে আপনার হাত দিয়ে বইয়ের প্যাকেটে নওলাখা হার পাচার করার আইডিয়া। মালটা গোরে পাঠাচ্ছিল তারই এক গ্যাঙের লোককে—যে খুব সম্ভবত থাকে শিবাজী কাস্লেরই সতেরো নম্বর তলার দুনম্বর ফ্ল্যাটে। আপনি যদি ধরা পড়েন, তা হলে দোষ দেবেন সান্যালকে, গোরেকে নয়—তাই তো? অর্থাৎ সান্যালকে খাড়া করে গোরে নিজে থাকছে সেফসাইডে।

এদিকে হয়ে গেল গণ্ডগোল। আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার হারের বদলে চালান করে বসলেন আপনারই পাঁচটাকা দামের বই। সেই বইয়ের প্যাকেট নিয়ে লালশার্ট অর্থাৎ নিম্মো শিবাজী কাসলের লিফট দিয়ে উঠছিল সতেরোতলায়; সেই সময় গোরেরই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাঙের লোক নিম্মোকে আক্রমণ করে প্যাকেট

আদায় করার জন্য। নিম্মো তাকে খুন করে প্যাকেট যথাস্থানে চালান দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদিকে প্যাকেটে যে হার নেই সে খবর পেতেই গোরেকে চলে আসতে হল। সে তো বুঝেছে কী হয়েছে। তার এখন দুটো কাজ করতে হবে। এক, হার ফিরে পেতে হবে; দুই, আমাদের খতম করতে হবে। তার একমাত্র ভরসা যে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটা পুলিশের হাতে জমা দিইনি। গোরে এসেই বুঝল যে সান্যালের পুনরাবিভাবের প্রয়োজন হবে। সান্যালই যখন মালটা পাঠিয়েছিল, তখন সান্যালকেই সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে, তা হলে গোরের নিজের উপর কোনও সন্দেহ পড়বে না।

কিন্তু গুলবাহার—

বলছি, বলছি—সব বলছি। গুলবাহার সেন্টের ব্যবহারটা গোরের শয়তানি বুদ্ধির আশ্চর্য উদাহরণ। এটার জন্য সে কলকাতা থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। সান্যাল মানেই গুলবাহার, আর গুলবাহার মানেই সান্যাল—এ ধারণা অন্তত আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি?

হ্যাঁ—তা একরকম হয়েছিল বইকী।

বেশ। এবার মনে করে দেখুন—সেদিন গোরে আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—ভাবটা যেন আপনার জন্যে টাকা আনতে গিয়েছে—কেমন?

ঠিক।

সেই ফাঁকে লিফটে ঢুকে দুফোঁটা গুলবাহার সেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার? উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব কটা তলা শুঁকেও যখন কোনও সেন্টের গন্ধ পেলাম না, তখনই বুঝলাম যে গন্ধটা রয়েছে শুধু লিফটের ভিতর। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষের গা থেকে নয়, এসেছে সেন্টের শিশি থেকে। ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোটাস সিনেমার সামনে গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট গাড়ির সিটে ছিটিয়ে দেওয়াও অতি সহজ ব্যাপার।

ফেলুদা বুঝিয়ে দিলে সত্যিই সহজ। লালমোহনবাবুও যে ব্যাপারটা বুঝেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তাঁর মুখে হাসি ফুটছে না দেখে বেশ অবাক লাগল। সেটা যে শেষ পর্যন্ত পুলকবাবুর একটা কথায় ফুটবে সেটা কী করে জানব?

চা শেষ করে যখন শহরে ফেরার তোড়জোড় চলছে, সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে দিচ্ছে, তখন দেখি পুলকবাবু আমাদের দিকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।

লালুদা, জেট বাহাদুরের বিজ্ঞাপন পড়ছে শুক্কুরবার—কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার।

কী ব্যাপার ভাই?

আপনার কোন নামটা যাবে—আসল না নকল?

নকলটাই আসল ভাই, একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু, বানান হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ।